গন্তব্যস্থল সম্পর্কে তাঁর সঙ্গীকে অবহিত করা। সফরের জরুরী বিষয়াদি সম্পর্কে সঙ্গীকে অবহিত করাও একটি আদব। অহংকারীরা তাদের খাদেম ও পরিচারকদেরকে সম্বোধনেরই যোগ্য মনে করে না এবং নিজের সফর সম্পর্কে কোন কিছুই বলে না।

حُقُبًا শব্দটি حُقْبَةٌ এর বহুবচন। আভিধানিক অর্থে আশি বছরে এক হুকবা। কারও কারও মতে আরও বেশী সময়ে এক হুকবা হয়। এর কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। মূসা (আ) সঙ্গীকে বলে দিলেন যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী আমাকে দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌঁছাতে হবে। আমার সংকল্প এই যে, যতদিনই লাগুক, গন্তব্যস্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত সফর অব্যাহত রাখব। আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ পালনে পয়গম্বরদের সংকল্প এমনি দৃঢ় হয়ে থাকে।

খিযিরের চাইতে মূসা (আ)-র শ্রেষ্ঠত্ব, তার বিশেষ প্রশিক্ষণ ও মু'জিযা ঃ

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا

কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত মূসা (আ) পয়গম্বরকূলের মধ্যেও বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কথোপকথনের বিশেষ মর্যাদা তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য। হযরত খিযিরের নবুয়ত সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। যদি নবী মেনেও নেয়া যায়, তবে তিনি রসূল ছিলেন না। তাঁর কোন গ্রন্থ নেই এবং কোন বিশেষ উম্মতও নেই। তাই মূসা (আ) হযরত খিযিরের চাইতে সর্বাবস্থায় বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা নৈকট্যশীলদের সামান্যতম ত্রুটিও সংশোধন করেন। তাঁদের প্রশিক্ষণের খাতিরে সামান্যতম ত্রুটির জন্যেও তিরস্কার করা হয় এবং সে মাপকাঠিতেই তাঁদের দ্বারা ত্রুটি পূরণ করিয়ে নেয়া হয়। আগাগোড়া কাহিনীটি এই বিশেষ প্রশিক্ষণেরই বহিঃপ্রকাশ। 'আমি সর্বাধিক জ্ঞানী' মূসা (আ)-র মুখ থেকে অসতর্ক মুহূর্তে একথাটি বের হয়ে গেলে আল্লাহ্ তা'আলা তা অপছন্দ করেন। তাঁকে হুঁশিয়ার করার জন্য এমন এক বান্দার ঠিকানা তাঁকে দিলেন, যার কাছে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান ছিল। সেই জ্ঞান মূসা (আ)-র কাছে ছিল না। যদিও মূসা (আ)-র জ্ঞান মর্তবার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল, কিন্তু তিনি সেই বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না। এদিকে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে জ্ঞানার্জনের অসীম প্রেরণা দান করেছিলেন। ফলে নতুন জ্ঞানের কথা শুনেই তিনি তা অর্জন করার জন্য শিক্ষার্থীর বেশে সফর করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার কাছেই খিযিরের ঠিকানা জিজ্ঞেস করলেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে এখানেই খিযিরের সাথে মূসা (আ)-র সাক্ষাত অনায়াসে ঘটাতে পারতেন অথবা মূসা (আ)-কেই পরিষ্কার ঠিকানা বলে দিতে পারতেন। ফলে সেখানে পৌঁছা কষ্টকর হত না। কিন্তু ঠিকানা অস্পষ্ট রেখে বলা হয়েছে যে, যেখানে মৃত মাছ জীবিত হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, সেখানেই খিযিরকে পাওয়া যাবে।

বোখারীর হাদীস থেকে মাছ সম্পর্কে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই থলিয়ায় মাছ রেখে দেয়ার নির্দেশ হয়েছিল। তবে তা খাবার হিসেবে রাখার আদেশ হয়েছিল, না অন্য কোন উদ্দেশ্যে---তা জানা যায় না। তবে উভয় সম্ভাবনাই রয়েছে। তাই কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, এই ভাজা করা মাছটি খাওয়ার জন্য রাখা হয়েছিল এবং তারা তা থেকে সফরকালে আহারও করেছেন। মাছটির অর্ধেক জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যায়।

ইবনে আতিয়্যা ও অন্য কয়েকজন একথাও বর্ণনা করেছেন যে, মাছটি মু'জিযা হিসেবে পরবর্তীকালে জীবিত ছিল এবং অনেকে তা দেখেছে বলেও দাবি করেছে। মাছটির এক পার্শ্ব অক্ষত এবং অপর পার্শ্ব ভক্ষিত ছিল। ইবনে আতিয়্যা নিজেও দেখেছেন বলে বর্ণনা করেছেন।---(কুরতুবী)

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, নাশতার থলে ছাড়া পৃথক একটি থলেতে মাছ রাখার নির্দেশ হয়েছিল। এ তফসীর থেকেও বোঝা যায় যে, মাছটি মৃত ছিল। কাজেই জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাওয়া একটি মু'জিযাই ছিল।

হযরত খিযিরের অস্পষ্ট ঠিকানা দেয়ার বিষয়টিও হযরত মূসা (আ)-র জন্য এক পরীক্ষা বৈ কিছুই ছিল না। এ পরীক্ষার উপর আরও পরীক্ষা ছিল এই যে, ঠিক গন্তব্যস্থলে পৌঁছে তিনি মাছের কথা ভুলে গেলেন। আয়াতে نَسِيَا حُوتَهُمَا বলে তাদের উভয়ের ভুলে যাওয়ার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু বোখারীর হাদীসে বর্ণিত কাহিনী থেকে জানা যায় যে, মাছটি জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাওয়ার সময় মূসা (আ) নিদ্রিত ছিলেন। শুধু ইউশা ইবনে নূন এ আশ্চর্য ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছিল এবং জাগ্রত হওয়ার পর মূসা (আ)-কে জানাবার ইচ্ছা করছিল। কিন্তু পরে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ভুলে ফেলে রাখেন। সুতরাং আয়াতে 'উভয়ে ভুলে গেলেন' কথাটা এমন হবে, যেমন অন্য এক আয়াতে يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ বলে মিঠা সমুদ্র ও লবণাক্ত সমুদ্র উভয়টি থেকে মোতি আহরিত হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ মোতি শুধু লবণাক্ত সমুদ্র থেকেই আহরিত হয়। কিন্তু تغليب-এর কায়দা অনুযায়ী এরূপ লেখার পদ্ধতি সাধারণভাবে প্রচলিত রয়েছে। এটাও সম্ভব যে, সেখান থেকে সামনের দিকে চলার সময় তারা উভয়েই মাছটি সঙ্গে নেয়ার কথা বিস্মৃত ছিলেন। তাই আয়াতে ভুলে যাওয়াকে উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

মোটকথা, মাছের বিষয়টি ভুলে না গেলে ব্যাপার সেখানেই শেষ হয়ে যেত। অথচ মূসা (আ)-র দ্বিতীয় পরীক্ষা নেয়া উদ্দেশ্য ছিল। তাই উভয়েই মাছের কথা ভুলে গেলেন এবং পূর্ণ একদিন ও একরাত্রির পথ অতিক্রম করার পর ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভব করলেন। এটা ছিল তৃতীয় পরীক্ষা। কেননা, এর আগেও ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভব করা উচিত ছিল। ফলে সেখানেই মাছের কথা স্মরণ হয়ে যেত এবং এত দূরবর্তী সফরের

প্রয়োজন হত না ; কিন্তু মূসা (আ) আরও একটু কষ্ট করুক, এটাই ছিল আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছা। তাই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভূত হয় এবং মাছের কথা মনে পড়ে। অতঃপর সেখান থেকেই তাঁরা পদচিহ্ন অনুসরণ করে ফিরে চলেন।

মাছের সমুদ্রে চলে যাওয়ার কথাটি প্রথমবার سَرَبًا শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ সুড়ঙ্গ। পাহাড়ে রাস্তা তৈরি করার জন্য অথবা শহরে ভূগর্ভস্থ পথ তৈরি করার উদ্দেশ্যে সুড়ঙ্গ খনন করা হয়। এ থেকে জানা গেল যে, মাছটি সমুদ্রে যেদিকে যেত, সেদিকে একটি সুড়ঙ্গের মত পথ তৈরি হয়ে যেত। বুখারীর হাদীস থেকে তাই জানা যায়। দ্বিতীয়বার যখন ইউশা ইবনে নূন দীর্ঘ সফরের পর এ ঘটনাটি উল্লেখ করে, তখন وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে। উভয় বর্ণনার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা পানিতে সুড়ঙ্গ তৈরি হওয়া স্বয়ং একটি অভ্যাসবিরুদ্ধ আশ্চর্য ঘটনা।

হযরত খিযিরের সাথে সাক্ষাত এবং তাঁর নবুয়তের প্রশ্ন ঃ কোরআন পাকে ঘটনার এই মূল ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়নি ; বরং عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا (আমার বান্দাদের একজন। বলা হয়েছে। বুখারীর হাদীসে তাঁর নাম খিযির উল্লেখ করা হয়েছে। খিযির অর্থ সবুজ-শ্যামল। সাধারণ তফসীরবিদগণ তাঁর এই নামকরণের কারণ প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি যেখানে বসতেন, সেখানেই ঘাস উৎপন্ন হয়ে যেত, মাটি যেরূপই হোক না কেন। কোরআন পাক একথাও বর্ণনা করে যে, খিযির পয়গম্বর ছিলেন না একজন ওলী ছিলেন। কিন্তু সাধারণ আলিমদের মতে তিনি যে নবী ছিলেন, একথা কোরআনে বর্ণিত ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয়। কেননা, এই সফরে যে কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে তন্মধ্যে কয়েকটি নিশ্চিতরূপেই শরীয়তবিরোধী। আল্লাহ্‌র ওহী ব্যতীত শরীয়তের নির্দেশ কোনরূপ ব্যতিক্রম হতে পারে না। নবী ও পয়গম্বর ছাড়া আল্লাহ্‌র ওহী কেউ পেতে পারে না। ওলী ব্যক্তিও কাশফ ও ইলহামের মাধ্যমে কোন কোন বিষয় জানতে পারেন, কিন্তু তা এমন প্রমাণ নয়, যার ভিত্তিতে শরীয়তের কোন নির্দেশ পরিবর্তন করা যায়। অতএব প্রমাণিত হল যে, খিযির আল্লাহ্‌র নবী ছিলেন। তাঁকে ওহীর মাধ্যমে কিছু সংখ্যক শরীয়তবিরোধী বিশেষ বিধান দান করা হয়েছিল। তিনি যা কিছু করেছেন, তা এই ব্যতিক্রমী বিধানের অনুসরণে করেছেন। কোরআনের নিম্নোক্ত বাক্যে তাঁর পক্ষ থেকেও এ বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে ঃ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي অর্থাৎ আমি নিজের পক্ষ থেকে কোন কিছু করিনি ; বরং আল্লাহ্‌র নির্দেশে করেছি।

মোটকথা, সাধারণ আলিমদের মতে হযরত খিযির (আ) ও একজন নবী। তবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁকে কিছু অপার্থিব দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল এবং এ সম্পর্কিত জ্ঞানও দান করা হয়েছিল। মূসা (আ) এগুলো জানতেন না। তাই তিনি আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন। তফসীর কুরতুবী, বাহ্‌রে মুহীত, আবূ হাইয়্যান প্রভৃতি গ্রন্থে এই বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে।

কোন ওলীর পক্ষে শরীয়তের বাহ্যিক নির্দেশ অমান্য করা জায়েয নয় : অনেক মূর্খ, পথভ্রষ্ট, সূফীবাদের কলংকস্বরূপ লোক একথা বলে বেড়ায় যে, শরীয়ত ভিন্ন জিনিস আর তরীকত ভিন্ন জিনিস। অনেক বিষয় শরীয়তে হারাম, কিন্তু তরীকতে হালাল। কাজেই কোন ওলীকে প্রকাশ্য কবীরা গোনাহে লিপ্ত দেখেও আপত্তি করা ঠিক নয়। উপরোক্ত আলোচনা থেকেই জানা গেল যে, তাদের এসব কথা পরিষ্কার ধর্মদ্রোহিতা ও বাতিল। হযরত খিযির (আ)-কে দুনিয়ার কোন ওলীর মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না। এবং শরীয়তের বিরুদ্ধে তাঁর কোন কাজকে বৈধ বলা যায় না।

শিষ্যের জন্য গুরুর অনুসরণ অপরিহার্য : هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلٰى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا এখানে হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্‌র নবী ও শীর্ষস্থানীয় রসূল হওয়া সত্ত্বেও হযরত খিযিরের কাছে সবিনয় প্রার্থনা করেছেন যে, আমি আপনার জ্ঞান শিক্ষা করার জন্য আপনার সাহচর্য কামনা করি। এ থেকে বোঝা গেল যে, শিষ্য শ্রেষ্ঠ হলেও গুরুর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং তাঁর অনুসরণ করা ওয়াজিব। এটাই জ্ঞানার্জনের আদব।—(কুরতুবী, মাযহারী)

শরীয়ত বিরুদ্ধ কাজে নির্বিকার থাকা আলিমের পক্ষে জায়েয নয় : إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا

হযরত খিযির (আ) মূসা (আ)-কে বললেন, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। আসল তথ্য যখন আপনার জানা নেই, তখন ধৈর্য ধরবেনই বা কেমন করে? উদ্দেশ্য এই যে, আমি যে জ্ঞানলাভ করেছি, তা আপনার জ্ঞান থেকে ভিন্ন ধরনের। তাই আমার কাজকর্ম আপনার কাছে আপত্তিকর ঠেকবে। আসল তথ্য আপনাকে না বলা পর্যন্ত আপনি নিজ কর্তব্যের খাতিরে আপত্তি করবেন।

মূসা (আ) স্বয়ং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর কাছে গমনের এবং তাঁর কাছ থেকে জ্ঞানার্জনের নির্দেশ পেয়েছিলেন। তাই তাঁর কোন কাজ প্রকৃতপক্ষে শরীয়তবিরোধী হবে না, এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। তাই তিনি ধৈর্যধারণের ওয়াদা করে নিলেন। নতুবা এরূপ ওয়াদা করাও কোন আলিমের জন্য জায়েয নয়। কিন্তু পরে শরীয়ত সম্পর্কে ধর্মীয় মর্যাদাবোধের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে কৃত ওয়াদা ভুলে গেলেন।

প্রথম ঘটনাটি তেমন গুরুতরও ছিল না। শুধু নৌকাওয়ালাদের আর্থিক ক্ষতি অথবা পানিতে ডুবে যাওয়ার নিছক সম্ভাবনাই ছিল, যা পরে বাস্তবে পরিণত হয়নি। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলীতে মূসা (আ) আপত্তি না করার ওয়াদাও করেননি। বালক হত্যার ঘটনা দেখে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং এ প্রতিবাদের জন্য কোন ওযরও পেশ করেননি। শুধু এতটুকু বললেন যে, ভবিষ্যতে প্রতিবাদ করলে আমাকে সাহচর্য দান না করার অধিকার আপনার থাকবে। কেননা, শরীয়তবিরুদ্ধ কাজ বরদাশ্‌ত করা কোন নবী ও রসূলের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তবে প্রকৃতপক্ষেও যেহেতু পয়গম্বর ছিলেন, তাই অবশেষে এই রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় যে, এসব ঘটনা খিযির (আ)-এর জন্য শরীয়তের সাধারণ নিয়মবহির্ভূত করে দেয়া হয়েছিল এবং তিনি ওহীর প্রত্যাদেশ অনুযায়ীই এগুলো সম্পাদন করেছিলেন।----(মাযহারী)

মূসা (আ)-এর জ্ঞান ও খিযির (আ)-এর জ্ঞানের একটি মৌলিক পার্থক্য এবং উভয়ের বাহ্যিক বৈপরীত্যে সমাধান ঃ এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন হয় যে, খিযির (আ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর জ্ঞান মূসা (আ)-র জ্ঞান থেকে ভিন্ন ধরনের ছিল। কিন্তু উভয় জ্ঞানই যখন আল্লাহ্‌প্রদত্ত তখন উভয়ের বিধি-বিধানে বৈপরীত্য ও বিরোধ কেন? এ সম্পর্কে তফসীর মাযহারীতে হযরত কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথীর বক্তব্য সত্যের অধিক নিকটবর্তী এবং আকর্ষণীয়। আমি তাঁর বক্তব্যের যে মর্ম বুঝতে পেরেছি, তার সার-সংক্ষেপ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে ওহী ও নবুয়তের মর্যাদায় ভূষিত করেন, সাধারণত তাঁদেরকে জন-সংস্কারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তাঁদের প্রতি গ্রন্থ ও শরীয়ত নাযিল করা হয়। এগুলোতে জনগণের হিদায়েত ও সংশোধনের নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ থাকে। কোরআন পাকে যত নবী রসূলের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের সবার উপরই শরীয়তের আইন প্রয়োগ ও সংশোধনের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। তাঁদের কাছে আগত ওহীও ছিল এই দায়িত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু অপরদিকে কিছু সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কিত দায়িত্বও তাঁদের উপর রয়েছে। সে সবের জন্য সাধারণভাবে ফেরেশতাগণ নিয়োজিত রয়েছেন। কিন্তু কোন কোন পয়গম্বরকেও আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরনের দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত করেছেন। হযরত খিযির (আ) তাঁদেরই একজন। সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কিত দায়িত্ব আনুষঙ্গিক ঘটনাবলীর সাথে সম্পৃক্ত ; যেমন অমুক ডুবন্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হোক অথবা অমুককে নিপাত করা হোক অথবা অমুককে উন্নতি দান করা হোক। এগুলোর বিধি-বিধানও জনগণের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। এসব আনুষঙ্গিক ঘটনার মধ্যে কিছুসংখ্যক এমনও থাকে যে, এক ব্যক্তিকে নিপাত করা শরীয়তের আইনবিরুদ্ধ, কিন্তু অপার্থিব আইনে এই বিশেষ ব্যাপারটিকে শরীয়তের সাধারণ আইনের আওতার বাইরে রেখে ঐ পয়গম্বরের জন্য বৈধ করে দেয়া হয়, যার যিম্মায় সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কিত এই বিশেষ দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। এমতাবস্থায় শরীয়তের আওতাবহির্ভূত বিশেষ পরিস্থিতিজনিত এই নির্দেশটি শরীয়তের আইনবিশেষজ্ঞদের জানা থাকে না। ফলে তারা একে হারাম বলতে বাধ্য হন এবং যাকে এই আইন থেকে পৃথক রাখা হয়, তিনি যথাস্থানে সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

মোটকথা যেখানে বৈপরীত্য দেখা যায়, সেখানে প্রকৃত প্রস্তাবে বিপরীত নয় বরং আনুসঙ্গিক ঘটনা শরীয়তের সাধারণ আইন থেকে ব্যতিক্রম থাকে মাত্র। আবূ হাইয়্যান বাহ্‌রে-মুহীতে বলেন ঃ

الجمهور على ان الخضر نبي وكان علمه معرفة بواطن قد
اوحيت اليه وعلم موسى الاحكام والفتيا بالظاهر۔

তাই এই ব্যতিক্রমটি নবুয়ত সম্পর্কিত ওহীর মাধ্যমে হওয়া জরুরী। কোন কাশ্‌ফ ও ইলহাম এই ব্যতিক্রমের জন্য যথেষ্ট নয়। হযরত খিযির কর্তৃক বালক হত্যা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম ছিল, কিন্তু তাঁকে সৃষ্টিগতভাবে শরীয়তের এই আইনের উর্ধ্বে রেখে এ কাজের জন্য আদেশ করা হয়েছিল। নবী নয়---এমন কোন ব্যক্তিকে তাঁর মাপকাঠিতে বিচার করে কোন হারামকে হালাল মনে করা---যেমন ভণ্ড সূফীদের মধ্যে প্রচলিত আছে---সম্পূর্ণ ধর্মদ্রোহিতা ও ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার নামান্তর।

ইবনে আবী শায়বা হযরত ইবনে আব্বাসের ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একবার নাজদাহ্ হারুরী (খারেজী) ইবনে আব্বাসের কাছে পত্র লিখল যে, হযরত খিযির (আ) নাবালেগ বালককে কিরূপে হত্যা করলেন, অথচ রসূলুল্লাহ্ (সা) নাবালেগ হত্যা করতে নিষেধ করেছেন? ইবনে আব্বাস জওয়াবে লিখলেন ঃ কোন বালক সম্পর্কে যদি তোমার ঐ জ্ঞান অর্জিত হয়ে যায়, যা খিযির (আ)-এর অর্জিত হয়েছিল, তবে তোমার জন্যও নাবালেগ হত্যা করা জায়েয হয়ে যাবে। উদ্দেশ্য এই যে, খিযির (আ) নবুয়তের ওহীর মাধ্যমে এই জ্ঞান লাভ করেছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পর নবুয়ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে এখন এই জ্ঞান কেউ লাভ করতে পারবে না।---(মাযহারী)

এ ঘটনা থেকে এ কথা জানা গেল যে, কোন ব্যক্তিকে শরীয়তের আইনের উর্ধ্বে সাব্যস্ত করার অধিকার একমাত্র ওহীর অধিকারী পয়গম্বরেরই রয়েছে।

فَانْطَلَقَا حَتّٰٓى اِذَا رَكِبَا فِى السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ؕ قَالَ اَخَرَقْتَهَا
لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا اِمْرًا ﴿٧١﴾ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ
لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِىْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا
تُرْهِقْنِىْ مِنْ اَمْرِىْ عُسْرًا ﴿٧٣﴾ فَانْطَلَقَا حَتّٰٓى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا
فَقَتَلَهٗ ۙ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ ؕ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا
نُكْرًا ﴿٧٤﴾ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾

قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِيْ ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ
لَّدُنِّيْ عُذْرًا ﴿٧٦﴾ فَانْطَلَقَا ٚ حَتّٰٓى إِذَآ أَتَيَآ أَهْلَ قَرْيَةِ ۣ اسْتَطْعَمَآ
أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ أَنْ
يَّنْقَضَّ فَأَقَامَهٗ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾ قَالَ هٰذَا
فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾

(৭১) অতঃপর তারা চলতে লাগলঃ অবশেষে যখন তারা নৌকায় আরোহণ করল, তখন তিনি তাতে ছিদ্র করে দিলেন। মূসা বললেনঃ আপনি কি এর আরোহীদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্য এতে ছিদ্র করে দিলেন? নিশ্চয়ই আপনি একটি গুরুতর মন্দ কাজ করলেন। (৭২) তিনি বললেনঃ আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য্য ধরতে পারবেন না। (৭৩) মূসা বললেনঃ আমাকে আমার ভুলের জন্য অপরাধী করবেন না এবং আমার কাজে আমার উপর কঠোরতা আরোপ করবেন না। (৭৪) অতঃপর তারা চলতে লাগল। অবশেষে যখন একটি বালকের সাক্ষাত পেল, তখন তিনি তাকে হত্যা করলেন। মূসা বললেনঃ আপনি কি একটি নিষ্পাপ জীবন শেষ করে দিলেন প্রাণের বিনিময় ছাড়াই? নিশ্চয়ই আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন। (৭৫) তিনি বললেনঃ আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না। (৭৬) মূসা বললেনঃ এরপর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি তবে আপনি আমাকে সাথে রাখবেন না। আপনি আমার পক্ষ থেকে অভিযোগমুক্ত হয়ে গেছেন। (৭৭) অতঃপর তারা চলতে লাগল; অবশেষে যখন একটি জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে তাদের কাছে খাবার চাইল, তখন তারা তাদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল। অতঃপর তারা সেখানে একটি পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেল, সেটি তিনি সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। মূসা বললেনঃ আপনি ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে এর পারিশ্রমিক আদায় করতে পারতেন। (৭৮) তিনি বললেনঃ এখানেই আমার ও আপনার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হল। এখন যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেন নি, আমি তার তাৎপর্য বলে দিচ্ছি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মোটকথা পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা সাব্যস্ত হয়ে গেল।) অতঃপর উভয়েই (কোন একদিকে) চলতে লাগলেন; (সম্ভবত তাঁদের সাথে ইউশা'ও ছিল। কিন্তু সে মূসা (আ)-এর অধীনে ছিল। তাই দু'জনেরই উল্লেখ করা হয়েছে।) অবশেষে

(তাঁরা চলতে চলতে যখন এমন জায়গায় গিয়ে পেঁছিলেন, যেখানে নৌকায় আরোহণ করার প্রয়োজন দেখা দিল, তখন) উভয়েই নৌকায় আরোহণ করলেন, এ সময়ে তিনি (নৌকার একটি তক্তা উঠিয়ে) তাতে ছিদ্র করে দিলেন। মূসা (আ) বললেনঃ আপনি কি এর আরোহীদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে এতে ছিদ্র করে দিলেন? আপনি একটি গুরুতর (আশংকার) কাজ করলেন। তিনি বললেনঃ আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না? (অবশেষে তাই হয়েছে। আপনি অঙ্গীকার ঠিক রাখতে পারলেন না।) মূসা (আ) বললেন ঃ (আমি ভুলে গিয়েছিলাম।) আপনি আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না এবং আমার এই (অনুসরণের) কাজে আমার উপর (এমন) কঠোরতা আরোপ করবেন না। (যাতে ভুলত্রুটিও মার্জনা করা যায় না। ব্যাপারটি এখানেই শেষ হয়ে গেল।) অতঃপর উভয়েই (নৌকা থেকে নেমে সামনে) চলতে লাগলেন; অবশেষে যখন একটি (নাবালেগ) বালকের সাক্ষাত পেলেন; তখন তিনি তাকে হত্যা করলেন। মূসা (আ) (অস্থির হয়ে) বললেন ঃ আপনি কি একটি নিষ্পাপ জীবনকে শেষ করে দিলেন (তাও) কোন প্রাণের বদলা ছাড়াই? নিশ্চয় আপনি এক বিরাট অন্যায় কাজ করলেন। (প্রথমত এটা নাবালেগের হত্যা, যাকে খুনের বদলেও হত্যা করা যায় না। তদুপরি সে তো কাউকে হত্যাও করেনি। এ কাজটি প্রথম কাজের চাইতেও গুরুতর। কেননা, প্রথম কাজে ছিল শুধু আর্থিক ক্ষতি। আরোহীদের নিমজ্জিত হওয়ার আশংকা, কিন্তু তা রোধ করা হয়েছিল। এ ছাড়া নাবালেগ বালক সর্বপ্রকার গোনাহ্ থেকে মুক্ত।) তিনি বললেনঃ আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না? মূসা (আ) বললেন ঃ (যাক, এবারও ক্ষমা করুন, কিন্তু) এরপর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে সাথে রাখবেন না! নিশ্চয় আপনি আমার পক্ষ থেকে (চূড়ান্তরূপে) নির্দোষ হয়ে গেছেন। [এবার মূসা (আ)-ভুলের জন্য কোন ওযর পেশ করেননি। এতে বোঝা যায় যে, এ প্রশ্নটি তিনি পয়গম্বরসুলভ মর্যাদার ভিত্তিতে ইচ্ছাকৃতভাবেই করেছিলেন।] অতঃপর উভয়েই সামনে চলতে লাগলেন; অবশেষে যখন একটি জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌছে তাদের কাছে খাবার চাইলেন (যে, আমরা অতিথি;) তখন তারা তাঁদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল। ইতিমধ্যে তারা সেখানে একটি পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেলেন। তখন তিনি তাকে (হাতের ইশারায় মু'জিযাস্বরূপ) সোজা করে দিলেন। মূসা (আ) বললেনঃ আপনি ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে এর পারিশ্রমিক আদায় করতে পারতেন। (ফলে আমাদের অভাবও দূর হত এবং তাদেরও অভদ্রতার সংশোধন হয়ে যেত।) তিনি বললেন ঃ এ হচ্ছে আমার ও আপনার বিচ্ছেদের সময় (যেমন আপনি নিজেই বলেছিলেন।) এবার আমি সে বিষয়ের স্বরূপ বলে দিচ্ছি, যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেননি? —পরবর্তী আয়াতে তা বর্ণিত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا —বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে, খিযির (আ)

কুড়াল দ্বারা নৌকার একটি তক্তা বের করে দেন। ফলে নৌকায় পানি ঢুকে নিমজ্জিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। এ কারণেই মূসা (আ) প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেন। কিন্তু ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, পানি নৌকায় প্রবেশ করেনি---মু'জিযার কারণে হোক কিংবা খিযির (আ) কর্তৃক এর কিছুটা মেরামত করার কারণে হোক। বগভীর রেওয়ায়েতে আছে যে, এই তক্তার জায়গায় খিযির (আ) একটি কাঁচ লাগিয়ে দেন। কোরআনের পূর্বাপর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, নৌকা ডুবিয়ে কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। এর দ্বারা উপরোক্ত রেওয়ায়েতগুলো সমর্থিত হয়।

حَتّٰى إِذَا لَقِيَا غُلٰمًا---আরবী ভাষায় **غلام** শব্দের অর্থ নাবালেগ বালক। যে বালককে খিযির (আ) হত্যা করেন, তার সম্পর্কে অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন যে, সে নাবালক ছিল। পরবর্তী বাক্যে نَفْسًا زَكِيَّةً শব্দ থেকেও তাঁর নাবালকত্বের সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা, زَكِيَّةً শব্দের অর্থ গোনাহ্ থেকে পবিত্র। এ গুণটি হয় পয়গম্বরদের মধ্যে পাওয়া যায়, না হয় নাবালেগ বাচ্চাদের মধ্যে পাওয়া যায়। নাবালেগদের আমলনামায় কোন গোনাহ্ লিপিবদ্ধ করা হয় না।

أَهْلَ قَرْيَةٍ---হযরত খিযির (আ) যে জনপদে পৌঁছেন এবং যার অধিবাসীরা তাঁর আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করে, হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে সেটিকে এন্তাকিয়া ও ইবনে সীরীনের রেওয়ায়েতে 'আইকা' বলা হয়েছে। হযরত আবূ হোরায়রা থেকে বর্ণিত আছে যে, সেটি ছিল আন্দালুসের একটি জনপদ। ---(মাযহারী)

والله اعلم

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُّ أَنْ
أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾ وَأَمَّا
الْغُلٰمُ فَكَانَ أَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّ
كُفْرًا ﴿٨٠﴾ فَأَرَدْنَآ أَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾
وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا
وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ۚ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَّبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا

كَنْزَهُمَا ۖ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۗ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ
مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾

(৭৯) নৌকাটির ব্যাপার---সেটি ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির। তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত। আমি ইচ্ছা করলাম যে, সেটিকে ত্রুটিযুক্ত করে দেই। তাদের অপরদিকে ছিল এক বাদশাহ। সে বলপ্রয়োগে প্রত্যেকটি নৌকা ছিনিয়ে নিত। (৮০) বালকটির ব্যাপার---তার পিতামাতা ছিল ঈমানদার। আমি আশংকা করলাম যে, সে অবাধ্যতা ও কুফর দ্বারা তাদেরকে প্রভাবিত করবে। (৮১) অতঃপর আমি ইচ্ছা করলাম যে, তাদের পালনকর্তা তাদেরকে মহত্তর তার চাইতে পবিত্রতায় ও ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর একটি শ্রেষ্ঠ সন্তান দান করুক। (৮২) প্রাচীরের ব্যাপার---সেটি ছিল নগরের দু'জন পিতৃহীন বালকের। এর নিচে ছিল তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং আপনার পালনকর্তা দয়াবশত ইচ্ছা করলেন যে, তারা যৌবনে পদার্পণ করুক এবং নিজেদের গুপ্তধন উদ্ধার করুক। আমি নিজ মতে এটা করিনি। আপনি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণ করতে অক্ষম হয়েছিলেন, এটাই তার ব্যাখ্যা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং সে নৌকার ব্যাপার---সেটি ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির। তারা (এরই মাধ্যমে) সমুদ্রে মেহনত-মজুরি করত। (এর দ্বারাই তারা জীবিকা নির্বাহ করত।) আমি ইচ্ছা করলাম যে, সেটিকে ত্রুটিযুক্ত করে দেই। (কারণ,) তাদের সামনের দিকে একজন (অত্যাচারী) বাদশাহ ছিল। সে প্রতিটি (উৎকৃষ্ট) নৌকা জোর-জবরদস্তি করে ছিনিয়ে নিত। (আমি নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করে বাহ্যত অকেজো করে না দিলে এটিও ছিনিয়ে নেয়া হত। ফলে দরিদ্র মজুরদের জীবিকার অবলম্বন শেষ হয়ে যেত। এটিই ছিল ছিদ্র করার উপকারিতা।) বালকটির ব্যাপার ---তার পিতামাতা ছিল ঈমানদার। (বালকটি বড় হলে কাফির ও জালিম হত। পিতামাতা তাকে খুব ভালবাসত।) অতএব আমি আশংকা করলাম যে, সে অবাধ্যতা ও কুফরের মাধ্যমে তাদেরকেও না আবার প্রভাবিত করে দেয়! (অর্থাৎ পুত্রের ভালবাসায় তারাও না ধর্মদ্রোহী হয়ে যায়।) সুতরাং আমি ইচ্ছা করলাম যে, (তাকে তো শেষ করে দেয়া দরকার। অতঃপর) তার পরিবর্তে তাদের পালনকর্তা তাদেরকে পবিত্রতায় ও ভালবাসার ঘনিষ্ঠতায় তার চাইতে শ্রেষ্ঠ সন্তান (ছেলে কিংবা মেয়ে) দান করুক। প্রাচীরের ব্যাপার---সেটি ছিল নগরের দু'জন এতীম বালকের। এর নিচে ছিল তাদের কিছু গুপ্তধন (যা তাদের পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে তারা পেয়েছিল) এবং তাদের (মৃত) পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি। তার সৎপরায়ণতার বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা তার ধন সংরক্ষিত রাখতে চাইলেন। প্রাচীর এই মুহূর্তে পড়ে গেলে সবাই গুপ্তধন লুটে-পুটে নিয়ে নিত।

এতীম বালকদের অভিভাবক সম্ভবত দেশে ছিল না যে, এর ব্যবস্থা করবে) তাই আপনার পালনকর্তা দয়াবশত চাইলেন যে, তারা উভয়েই যৌবনে পদার্পণ করুক এবং নিজেদের গুপ্তধন উদ্ধার করুক। (আমি আল্লাহ্‌র আদেশে এসব কাজ করেছি এবং এর মধ্যে) কোন কাজ আমি নিজ মতে করিনি। আপনি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণ করতে অক্ষম হয়েছিলেন, এটা হল তার স্বরূপ। [ওয়াদানুযায়ী আমি তা বর্ণনা করে দিলাম! অতঃপর খিযির (আ) বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।]

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ—কা'ব আহবার থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এই নৌকাটি যে দরিদ্রদের ছিল, তারা ছিল দশ ভাই। তন্মধ্যে পাঁচ জন ছিল বিকলাঙ্গ। অবশিষ্ট পাঁচ ভাই মেহনত-মজুরি করে সবার জীবিকার ব্যবস্থা করত। সমুদ্রে নৌকা চালিয়ে ভাড়া উপার্জন করাই ছিল তাদের মজুরি।

মিসকীনের সংজ্ঞা ঃ কারও কারও মতে মিসকীন এমন ব্যক্তি, যার কাছে কিছুই নেই। কিন্তু আলোচ্য আয়াত থেকে মিসকীনের সঠিক সংজ্ঞা এই জানা যায় যে, অত্যাবশ্যকীয় অভাব পূরণ করার পর যার কাছে নিসাব পরিমাণ মালও অবশিষ্ট থাকে না, সে-ও মিসকীনের অন্তর্ভুক্ত। কেননা আয়াতে যাদেরকে মিসকীন বলা হয়েছে, তাদের কাছে কমপক্ষে একটি নৌকা তো ছিল, যার মূল্য নিসাবের চাইতে কম নয়। কিন্তু নৌকাটি অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনাদি পূরণে নিয়োজিত ছিল। তাই তাদেরকে মিসকীন বলা হয়েছে।---(মাযহারী)

مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا---বগভী হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, নৌকাটি যেদিকে যাচ্ছিল, সেখানে একজন জালিম বাদশাহ্‌ এই পথে চলাচলকারী সব নৌকা ছিনিয়ে নিত। হযরত খিযির এ কারণে নৌকার একটি তক্তা উপড়িয়ে দেন, যাতে জালিম বাদশাহ্‌ নৌকাটি ভাঙ্গা দেখে ছেড়ে দেয় এবং দরিদ্ররা বিপদের হাত থেকে বেঁচে যায়। মওলানা রুমী চমৎকার বলেছেন ঃ

گر خضر در بحر کشتی را شکست
صد درستی در شکست خضر هست

وَأَمَّا الْغُلَامُ---হযরত খিযির (আ) যে বালকটি হত্যা করেন, তার স্বরূপ এই বর্ণনা করেছেন যে, তার স্বভাবে কুফর ও পিতামাতার অবাধ্যতা নিহিত ছিল। তার পিতামাতা ছিল সৎ কর্মপরায়ণ লোক। হযরত খিযির (আ) বলেন ঃ আমার আশংকা ছিল

যে, ছেলেটি বড় হয়ে সৎ কর্মপরায়ণ পিতামাতাকে বিব্রত করবে এবং কষ্ট দেবে। সে কুফরে লিপ্ত হয়ে পিতামাতার জন্য ফিতনা হয়ে দাঁড়াবে এবং তার ভালবাসায় পিতামাতার ঈমানও বিপন্ন হয়ে পড়বে।

فَاَرَدْنَا اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّاَقْرَبَ رُحْمًا---অর্থাৎ এজন্য আমি ইচ্ছা করলাম, যে আল্লাহ্ তা'আলা এই সৎ কর্মপরায়ণ পিতামাতাকে এ ছেলের পরিবর্তে তার চাইতে উত্তম সন্তান দান করুক, যার কাজকর্ম ও চরিত্র পবিত্র হবে এবং সে পিতামাতার হকও পূর্ণ করবে।

আয়াতে اَرَدْنَا ও خَشِيْنَا ক্রিয়াপদে উত্তম পুরুষের বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। এর একটি সম্ভাব্য কারণ এই যে, খিযির (আ) এ দু'টি ক্রিয়াপদকে নিজের এবং আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সম্বন্ধ করেছেন। আর এটাও সম্ভব যে, নিজের দিকেই সম্বন্ধ করেছেন। এমতাবস্থায় اَرَدْنَا-এর অর্থ এই যে, আমি আল্লাহ্র কাছে দোয়া করলাম। কেননা এক ছেলের পরিবর্তে অন্য উত্তম ছেলে দান করা একান্তভাবেই আল্লাহ্ তা'আলার কাজ। এতে খিযির অথবা অন্য কেউ শরীক হতে পারেন না।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, ছেলেটি কাফির হবে এবং পিতামাতাকে পথভ্রষ্ট করবে---এ বিষয়টি যদি আল্লাহ্র জ্ঞানে ছিল তবে তাই বাস্তবায়িত হওয়া জরুরী ছিল। কেননা আল্লাহ্র জ্ঞানের বিরুদ্ধে কোন কিছু হতে পারে না।

উত্তর এই যে, আল্লাহ্র জ্ঞান এই শর্তসহ ছিল যে, সে প্রাপ্তবয়স্ক হলে কাফির হবে এবং পিতামাতার জন্য বিপদ হবে। এরপর যখন সে পূর্বেই নিহত হয়েছে, তখন এই ঘটনা আল্লাহ্র জ্ঞানের বিপক্ষে নয়।---(মাযহারী)

ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুনযির ও ইবনে আবী হাতেম আতিয়্যার বাচনিক বর্ণনা করেন যে, নিহত ছেলের পিতামাতাকে আল্লাহ্ তা'আলা তার পরিবর্তে একটি কন্যা দান করেন, যার গর্ভে দু'জন নবী জন্মগ্রহণ করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তার গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী (নবীর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা একটি বিরাট উম্মতকে হিদায়েত দান করেন।

وَتَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا---হযরত আবুদ্দারদা রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রাচীরের নিচে রক্ষিত ইয়াতীম বালকদের গুপ্তধন ছিল স্বর্ণ-রৌপ্যের ভাণ্ডার---(তিরমিযী, হাকিম)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ সেটি ছিল স্বর্ণের একটি ফলক। তাতে নিম্নলিখিত উপদেশ বাক্যসমূহ লিখিত ছিল। হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা)-ও এই রেওয়ায়েতটি রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। (কুরতুবী)

১. বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম।

২. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে তকদীরে বিশ্বাস করে অথচ চিন্তাযুক্ত হয়।

৩. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে আল্লাহ্ তা'আলাকে রিযিকদাতারূপে বিশ্বাস করে ; এরপর প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিশ্রম ও অনর্থক চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে।

৪. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে মৃত্যুতে বিশ্বাস রাখে ; অথচ আনন্দিত ও প্রফুল্ল থাকে।

৫. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে পরকালের হিসাবনিকাশে বিশ্বাস রাখে, অথচ সৎ কাজে গাফিল হয়।

৬. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক যে দুনিয়ার নিত্যনৈমিত্তিক পরিবর্তন জেনেও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে।

৭. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্।

পিতামাতার সৎকর্মের উপকার সন্তান-সন্ততিরাও পায় ঃ **وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا** ---এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত খিযির (আ)-এর মাধ্যমে ইয়াতীম বালকদের জন্য রক্ষিত গুপ্তধনের হিফাযত এজন্য করানো হয় যে, তাদের পিতা একজন সৎ কর্মপরায়ণ আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা ছিলেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তার সন্তান-সন্ততির উপকারার্থে এ ব্যবস্থা করেন। মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এক বান্দার সৎ কর্মপরায়ণতার কারণে তার পরবর্তী সন্তান-সন্ততি বংশধর ও প্রতিবেশীদের হিফাযত করেন। ---(মাযহারী)

হযরত শিবলী (র) বলতেন ঃ আমি এই শহর এবং সমগ্র এলাকার জন্য শান্তির কারণ। তাঁর ওফাতের পর তাঁর দাফন সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে দায়লামের কাফিররা দাজলা নদী অতিক্রম করে বাগদাদ নগরী অধিকার করে। তখন সবাই বলাবলি করতে থাকে যে, আমাদের উপর দ্বিগুণ বিপদ চেপেছে অর্থাৎ শিবলীর ওফাত ও দায়লামের পতন।---(কুরতুবী; ১১ খণ্ড, ২৯ পৃঃ)

তফসীর মাযহারীতে বলা হয়েছে, আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আলিম ও সৎ কর্মপরায়ণদের সন্তান-সন্ততিদের খাতির করা এবং তাদের প্রতি স্নেহপরায়ণ হওয়া উচিত, যে পর্যন্ত না তারা পুরোপুরি পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا - أَشُدَّ শব্দটি **شَدٌّ** -এর বহুবচন। অর্থ শক্তি এবং সে বয়স, যাতে মানুষ পূর্ণ শক্তি অর্জন এবং ভালমন্দের পার্থক্য করতে সক্ষম হয়। ইমাম আবু হানীফার মতে পঁচিশ বছর বয়ঃক্রম এবং কারও মতে চল্লিশ বছর বয়ঃক্রম।

কেননা, কোরআন পাকে রয়েছে حَتّٰى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً

—(মাযহারী)

পয়গম্বরসুলভ অলংকার ও আদবের একটি দৃষ্টান্ত ঃ এ দৃষ্টান্তটি বোঝার আগে একটি জরুরী বিষয় বুঝে নেওয়া দরকার। তা এই যে, দুনিয়াতে কোন ভাল অথবা মন্দ কাজ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে সম্পন্ন হতে পারে না। ভালমন্দ সবই আল্লাহ্‌র সৃজিত এবং তাঁর ইচ্ছার অধীন। যে সব বিষয়কে মন্দ বলা হয়, সেগুলো বিশেষ ব্যক্তি অথবা বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই মন্দ কথিত হওয়ার যোগ্য, কিন্তু সামগ্রিক বিশ্বের প্রকৃতির জন্য সবই জরুরী এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টি হিসাবে সবই উত্তম ও রহস্যের উপর নির্ভরশীল।

کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں

মোটকথা দুনিয়াতে যেসব বিপদ ও দুর্ঘটনা ঘটে সেগুলো আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত ঘটতে পারে না। এদিক দিয়ে প্রত্যেক ভাল ও মন্দের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলাকে বলা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির দৃষ্টিকোণে কোন মন্দই মন্দ নয়। তাই আল্লাহ্ তা'আলাকে মন্দের স্রষ্টা না বলা আদব। কোরআনে উল্লিখিত হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর বাক্য এ আদবই শিক্ষা দেয়। তিনি বলেন ঃ

اَلَّذِىْ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ - এতে তিনি পানাহার করানোকে আল্লাহ্‌র প্রতি সম্পৃক্ত করেছেন এবং অসুস্থ হওয়ার সময় আরোগ্য দান করাকেও আল্লাহ্‌র প্রতিই সম্পৃক্ত করেছেন, কিন্তু মাঝখানে অসুস্থ হওয়াকে নিজের প্রতি সম্পৃক্ত করে اِذَا مَرِضْتُ বলেছেন অর্থাৎ যখন আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি, তখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আরোগ্য দান করেন। এরূপ বলেননি যে, যখন আল্লাহ্ আমাকে অসুস্থ করে দেন তখন আরোগ্যও দান করেন।

এবার হযরত খিযির (আ)-এর বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করুন। নৌকা ভাঙ্গার ইচ্ছা বাহ্যত একটি দূষণীয় ও মন্দ ইচ্ছা। তাই এ ইচ্ছাকে নিজের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করে اَرَدْتُّ বলেছেন। অতঃপর বালক হত্যা ও তার পরিবর্তে উত্তম সন্তান দান করার মধ্যে হত্যা ছিল মন্দ কাজ এবং উত্তম সন্তান দান করা ছিল ভাল কাজ। তাই এতদুভয়ের ইচ্ছার ক্ষেত্রে বহুবচন প্রয়োগ করে اَرَدْنَا অর্থাৎ 'আমরা ইচ্ছা করলাম' বলেছেন; যাতে বাহ্যিক মন্দ কাজটি নিজের সাথে এবং ভাল কাজটি আল্লাহ্‌র সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়। তৃতীয় ঘটনায় প্রাচীর সোজা করে ইয়াতিমদের গুপ্তধনের হেফাযত করা একটি সম্পূর্ণত ভাল কাজ।

তাই একে পুরোপুরি আল্লাহ্‌র দিকে সম্পৃক্ত করে فَأَرَادَ رَبُّكَ অর্থাৎ 'আপনার পালনকর্তা ইচ্ছা করলেন' বলেছেন।

হযরত খিযির (আ) জীবিত আছেন, না ওফাত হয়ে গেছে ঃ হযরত খিযির (আ) জীবিত আছেন, না তাঁর ওফাত হয়ে গেছে; এ বিষয়ের সাথে কোরআনে বর্ণিত ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই। তাই কোরআন ও হাদীসে স্পষ্টত এ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। কোন কোন রেওয়ায়েত ও উক্তি থেকে তাঁর অদ্যাবধি জীবিত থাকার কথা জানা যায়। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে এর বিপরীত বিষয় জানা যায়। ফলে এ ব্যাপারে সর্বকালেই আলিমদের বিভিন্নরূপ মতামত পরিদৃষ্ট হয়েছে। যাদের মতে তিনি জীবিত আছেন, তাদের প্রমাণ হচ্ছে মুস্তাদরাক হাকিম কর্তৃক হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত। তাতে বলা হয়েছে ঃ যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওফাত হয়ে যায়, তখন সাদাকালো দাড়িওয়ালা জনৈক ব্যক্তি আগমন করে এবং ভিড় ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করে কান্নাকাটি করতে থাকে। এই আগন্তুক সাহাবায়ে কিরামের দিকে মুখ করে বলতে থাকে ঃ

ان فى الله عزاء من كل مصيبة وعوضا من كل فائت وخلفا من كل هالك فالى الله فانيبوا واليه فارغبوا فانما المحروم من حرم الثواب-

আল্লাহ্‌র দরবারেই প্রত্যেক বিপদ থেকে সবর আছে, প্রত্যেক বিলুপ্ত বিষয়ের প্রতিদান আছে এবং তিনিই প্রত্যেক ধ্বংসশীল বস্তুর স্থলাভিষিক্ত। তাই তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন কর এবং তাঁর কাছেই আগ্রহ প্রকাশ কর। কেননা যে ব্যক্তি বিপদের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়, সে-ই প্রকৃত বঞ্চিত।

আগন্তুক উপরোক্ত বাক্য বলে বিদায় হয়ে গেলে হযরত আবূ বকর (রা) ও আলী (রা) বললেন ঃ ইনি হযরত খিযির (আ)। এ রেওয়ায়েতে বর্ণনা করাই এ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য।

মুসলিমের হাদীসে আছে যে, দাজ্জাল মদীনার নিকটবর্তী এক জায়গায় পেঁৗছলে মদীনা থেকে এক ব্যক্তি তার মুকাবিলার জন্য বের হবেন। তিনি তৎকালীন লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হবেন কিংবা শ্রেষ্ঠতম লোকদের অন্যতম হবেন। আবূ ইসহাক বলেন ঃ এ ব্যক্তি হবেন হযরত খিযির (আ)।

ইবনে আবিদ দুনিয়া 'কিতাবুল হাওয়াতিফে' বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) হযরত খিযির (আ)-এর সাথে সাক্ষাত করলে তিনি তাঁকে একটি দোয়া বলে দেন। যে ব্যক্তি এই দোয়া প্রত্যেক নামাযের পর পাঠ করবে; সে বিরাট সওয়াব, মাগফিরাত ও রহমত পাবে। দোয়াটি এই ঃ

يَا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ وَيَا مَنْ لَا تُغْلِطُهُ الْمَسَائِلُ وَيَا مَنْ
لَا يَبْرَمُ مِنْ اِلْحَاحِ الْمُلِحِّيْنَ اَذِقْنِيْ بَرْدَ عَفْوِكَ وَحَلَاوَةَ مَغْفِرَتِكَ۔

"হে ঐ সত্তা, যার এক কথা শোনা অন্য কথা শোনায় প্রতিবন্ধক হয় না, হে ঐ সত্তা, যাকে একই সময়ে করা লাখো কোটি প্রশ্ন বিভ্রান্ত করে না এবং হে ঐ সত্তা যিনি দোয়ায় পীড়াপীড়ি করলে এবং বারবার বললে বিরক্ত হন না; আমাকে তোমার ক্ষমার স্বাদ আস্বাদন করাও এবং তোমার মাগফিরাতের স্বাদ দান কর।"

অতঃপর এ গ্রন্থেই হুবহু এই ঘটনা, এই দোয়া এবং হযরত খিযির (আ)-এর সাথে সাক্ষাতের ঘটনা হযরত উমর (রা)-এর থেকেও বর্ণিত আছে।

পক্ষান্তরে যারা হযরত খিযির (আ)-এর জীবদ্দশা অস্বীকার করে, তাদের বড় প্রমাণ হচ্ছে সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস। হযরত ইবনে উমর বলেন: রসূলুল্লাহ্ (সা) জীবনের শেষ দিকে এক রাত্রে আমাদেরকে নিয়ে ইশার নামায পড়েন। নামায শেষে তিনি দাঁড়িয়ে যান এবং নিম্নোক্ত কথাগুলো বলেন:

ارأيتكم ليلتكم هذه فان على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن
هو على ظهر الارض احد۔

'তোমরা কি আজকের রাতটি লক্ষ্য করছ? এই রাত থেকে একশ' বছর অতীত হলে আজ যারা পৃথিবীতে আছে, তাদের কেউ জীবিত থাকবে না।'

হযরত ইবনে উমর অতঃপর বলেন: এই রেওয়ায়েত সম্পর্কে অনেকই অনেক রকম কথাবার্তা বলে। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এক শ' বছর অতীত হলে এ শতাব্দী শেষ হয়ে যাবে।

মুসলিমে এ রেওয়ায়েতটি হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকেও প্রায় এমনি বর্ণিত আছে। কিন্তু রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করার পর আল্লামা কুরতুবী বলেন এর ভাষায় তাদের পক্ষে কোন প্রমাণ নেই, যারা খিযির (আ)-এর জীবদ্দশাকে অস্বীকার করে। কেননা, এতে যদিও সমগ্র মানবজাতির জন্য ব্যাপক ভাষা তাগিদ সহকারে প্রয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু প্রত্যেক আদম সন্তানই এই ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, আদম সন্তানদের মধ্যে হযরত ঈসা (আ)-ও একজন। তিনি ওফাত পান নি। এবং নিহতও হননি। কাজেই হাদীসে ব্যবহৃত على الارض শব্দের মধ্যে যে আলিফলাম রয়েছে, বাহ্যত তা عهد -এর অর্থ দেয়। এবং এর অর্থ আরব ভূমি ইয়াজুজ-মাজুজের দেশ, প্রাচ্যদেশ ও দ্বীপপুঞ্জ---যেগুলোর নামও আরবরা কোনদিন শোনেনি। এ গুলোসহ সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠ হাদীসে বোঝানো হয়নি। এ হচ্ছে আল্লামা কুরতুবীর বক্তব্য।

কেউ কেউ খিযির (আ)-এর জীবদ্দশা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বলে যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে জীবিত থাকলে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করা তাঁর জন্য অপরিহার্য ছিল। কেননা হাদীসে বলা হয়েছে لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعى---অর্থাৎ মূসা (আ) জীবিত থাকলে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তাঁরও গত্যন্তর ছিল না। (কারণ আমার আগমনের ফলে তাঁর ধর্ম রহিত হয়ে গেছে)। কিন্তু এটা অসম্ভব নয় যে, খিযির (আ)-এর জীবন ও নবুয়ত সাধারণ পয়গম্বরদের থেকে ভিন্নরূপ হবে। তাঁকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সৃষ্টিগত দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। তাই তিনি সাধারণ মানুষ থেকে আলাদাভাবে নিজের কাজে নিয়োজিত আছেন। শরীয়তে মুহাম্মদীর অনুসরণের ব্যাপারে এটা সম্ভব যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়তের পর এ শরীয়তেরই অনুসরণ করে চলেছেন। والله اعلم

আবূ হাইয়্যান বাহ্‌রে মুহীত গ্রন্থে খিযির (আ)-র সাথে কয়েকজন বুযুর্গের সাক্ষাতের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সাথে সাথে একথাও বলেছেন যে, والجمهور على انه مات---অর্থাৎ সাধারণ আলিমদের মতে তাঁর ওফাত হয়ে গেছে।---(ষষ্ঠ খণ্ড ১৪৭ পৃঃ)

তফসীর মাযহারীতে কাযী সানাউল্লাহ বলেন ঃ হযরত সাইয়্যেদ আহমদ সরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী তাঁর কাশ্‌ফের মাধ্যমে যে কথা বলেছেন, তার মধ্যেই সব বিতর্কের সমাধান নিহিত আছে। তিনি বলেন ঃ আমি নিজে কাশ্‌ফ জগতে হযরত খিযির (আ)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন ঃ আমি ও ইলয়াস (আ) উভয়েই জীবিত নই। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এরূপ ক্ষমতা দান করেছেন যে, আমরা জীবিত মানুষের বেশ ধারণা করে বিভিন্নভাবে মানুষের সাহায্য করি।

আমি পূর্বেই বলেছি যে, হযরত খিযির (আ)-এর মৃত্যু ও জীবদ্দশার সাথে আমাদের কোন বিশ্বাসগত অথবা কর্মগত মাস'আলা জড়িত নয়। এ কারণেই কোরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কোন কিছু বলা হয়নি। তাই এ ব্যাপারে অতিরিক্ত আলোচনা ও খোঁজাখুঁজির প্রয়োজন নেই। কোন একদিকের উপর বিশ্বাস রাখাও আমাদের জন্য জরুরী নয়। কিন্তু প্রশ্নটি জনগণের মধ্যে বহুল প্রচলিত, তাই উল্লিখিত বিবরণ উদ্ধৃত করা হয়েছে।

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾ اِنَّا
مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْاَرْضِ وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾ فَاَتْبَعَ
سَبَبًا ﴿٨٥﴾ حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِىْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ

وَّوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۥ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّآ اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّآ
اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ﴿٨٦﴾ قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ
يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨٧﴾ وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَلَهٗ جَزَآءَ ۨالْحُسْنٰى ۚ وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾

(৮৩) তারা আপনাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন ঃ আমি তোমাদের কাছে তার কিছু অবস্থা বর্ণনা করব। (৮৪) আমি তাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের কার্যোপকরণ দান করেছিলাম। (৮৫) অতঃপর তিনি এক কার্যোপকরণ অবলম্বন করলেন। (৮৬) অবশেষে তিনি যখন সূর্যের অস্তাচলে পৌঁছলেন ; তখন তিনি সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং তিনি তথায় এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আমি বললাম হে যুলকারনাইন ! আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারেন। (৮৭) তিনি বললেনঃ যে কেউ সীমালঙ্ঘনকারী হবে, আমি তাকে শাস্তি দেব। অতঃপর তিনি তাঁর পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবেন। তিনি তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন। (৮৮) এবং যে বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে তার জন্য প্রতিদান রয়েছে কল্যাণ এবং আমার কাজে তাকে সহজ নির্দেশ দেবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যুলকারনাইনের প্রথম সফর ঃ তারা আপনাকে যুলকারনাইনের অবস্থা জিজ্ঞেস করে। [এর কারণ লিখিত রয়েছে এই যে, তাঁর ইতিহাস প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছিল। এ কারণেই এই কাহিনীর অতিরিক্ত বিষয়াদি, যা কোরআনে উল্লিখিত হয়নি, সে সম্পর্কে আজ পর্যন্ত ইতিহাসে তীব্র মতবিরোধ পরিদৃষ্ট হয়। এ কারণেই কোরাইশরা মদীনার ইহুদীদের পরামর্শে এ কাহিনীটি প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত করেছিল। তাই কোরআনে বর্ণিত এ ঘটনার বিবরণ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়তের সুস্পষ্ট প্রমাণ।] আপনি বলে দিন ঃ আমি এখনই তোমাদের কাছে তার অবস্থা বর্ণনা করব। (অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কাহিনীর বর্ণনা শুরু হয়েছে যে, যুলকারনাইন একজন প্রবল প্রতাপান্বিত বাদশাহ ছিলেন)। আমি তাকে পৃথিবীতে রাজত্ব দান করেছিলাম এবং আমি তাকে সব রকম সাজসরঞ্জাম দিয়েছিলাম, (যদ্দ্বারা তিনি রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়িত করতে পারতেন।) অতঃপর তিনি (পাশ্চাত্য দেশসমূহ জয় করার মানসে) এক পথ অবলম্বন করলেন (এবং সফর করতে লাগলেন)। অবশেষে তিনি যখন (চলতে চলতে মধ্যবর্তী শহরগুলো পদানত করে) সূর্যের অস্তাচলে (অর্থাৎ পশ্চিম প্রান্তের সর্বশেষ জনবসতি

পর্যন্ত) পৌঁছলেন, তখন সূর্যকে তিনি এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন। (সম্ভবত এর অর্থ সমুদ্র! সমুদ্রের পানি অধিকাংশ কাল দৃষ্টিগোচর হয়। সূর্য প্রকৃতপক্ষে সমুদ্রে অস্ত যায় না। কিন্তু সমুদ্র দিগন্ত হলে মনে হয় যেন, সমুদ্রেই অস্ত যাচ্ছে।) এবং তথায় তিনি এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। (পরবর্তী আয়াত أَمَّا مَنْ ظَلَمَ থেকে বোঝা যায় যে, তারা কাফির ছিল।) আমি (ইলহামের মাধ্যমে অথবা তৎকালীন পয়গম্বরের মধ্যস্থতায় তাকে) বললাম ঃ হে যুলকারনাইন, (এই সম্প্রদায় সম্পর্কে তোমাকে দু'রকম ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে) হয় (তাদেরকে প্রথমেই হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে) শাস্তি দেবে, না হয় তাদের ব্যাপারে সদয় ব্যবহার করতে হবে (অর্থাৎ তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেবে। যদি না মানে তবে হত্যা করবে। তবলীগ ও দাওয়াত ছাড়াই প্রথমে হত্যা করার ক্ষমতা সম্ভবত একারণে দেওয়া হয়েছিল যে, পূর্বে কোন উপায়ে তাদের কাছে ঈমানের দাওয়াত পৌঁছেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পথ, আগে দাওয়াত পরে হত্যা ---এটা যে উত্তম, তা ইঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে এবং اتخاذ حسن শব্দ দ্বারা তা ব্যক্ত করা হয়েছে।) যুলকারনাইন বললেন ঃ (আমি দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করে প্রথমে তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেব।) কিন্তু (দাওয়াতের পর) যে জালিম হবে, তাকে আমি (হত্যা ইত্যাদির) শাস্তি দেব (এ শাস্তি হবে পার্থিব) অতঃপর সে (মৃত্যুর পর) তার পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবে। তিনি তাকে (দোযখের) কঠোর শাস্তি দেবেন এবং যে (দাওয়াতের পর) বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সৎকর্ম করবে, তার জন্য (পরকালেও) প্রতিদানে কল্যাণ রয়েছে এবং আমিও (দুনিয়াতে) আমার ব্যবহারে তাকে সহজ (ও নম্র) কথা বলব। (অর্থাৎ কার্যক্ষেত্রে কঠোরতা করার প্রশ্নই উঠে না, কথায়ও কঠোরতা করা হবে না।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَيَسْئَلُوْنَكَ---অর্থাৎ তারা আপনাকে প্রশ্ন করে। কারা প্রশ্ন করেছিল, এ সম্পর্কে রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তারা ছিল মক্কার কোরাইশ সম্প্রদায়। মদীনার ইহুদীরা তাদেরকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত ও সততা যাচাই করার জন্য তিনটি প্রশ্ন বলে দিয়েছিল ঃ রূহ্, আসহাবে কাহ্‌ফ ও যুলকারনাইন সম্পর্কে। তন্মধ্যে দু'টি প্রশ্নের জওয়াব পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে তৃতীয় প্রশ্নের জওয়াব বর্ণিত হয়েছে যে, যুলকারনাইন কে ছিল এবং তার কি অবস্থা ছিল ? ---(বাহ্‌রেমুহীত)

যুলকারনাইন কে ছিলেন, কোন যুগে ও কোন দেশে ছিলেন এবং তার নাম যুলকারনাইন হল কেন ? যুলকারনাইন নামকরণের হেতু সম্পর্কে বহু উক্তি ও তীব্র মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। কেউ বলেন ঃ তাঁর মাথার চুলের দু'টি গুচ্ছ ছিল। তাই যুলকারনাইন, (দুই গুচ্ছওয়ালা) আখ্যায়িত হয়েছেন। কেউ বলেন ঃ পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশসমূহ জয়

করার কারণে যুলকারনাইন খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। কেউ এমনও বলেছেন যে, তার মাথায় শিং এর অনুরূপ দু'টি চিহ্ন ছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তার মাথার দুই দিকে দু'টি ক্ষত চিহ্ন ছিল। والله اعلم কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, কোরআন স্বয়ং তাঁর নাম যুলকারনাইন রাখেনি; বরং ইহুদীরা এ নাম বলেছিল। বোধ হয় তিনি তাদের কাছে এ নামেই খ্যাত ছিলেন। যুলকারনাইনের ঘটনা সম্পর্কে কোরআন পাক যা বর্ণনা করেছে, তা এই ঃ

> তিনি একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন এবং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশসমূহ জয় করেছিলেন। এসব দেশে তিনি সুবিচার ও ইনসাফের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সর্বপ্রকার সাজসরঞ্জাম দান করা হয়েছিল। তিনি দিগ্বিজয়ে বের হয়ে পৃথিবীর তিন প্রান্তে পৌঁছেছিলেন ---পাশ্চাত্যের শেষ প্রান্তে, প্রাচ্যের শেষ প্রান্তে এবং উত্তরে পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত। এখানেই তিনি দুই পর্বতের মধ্যবর্তী গিরিপথকে একটি সুবিশাল লৌহ প্রাচীর দ্বারা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে ইয়াজুজ-মাজুজের লুটতরাজ থেকে এলাকার জনগণ নিরাপদ হয়ে যায়।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত ও সত্যতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন উত্থাপনকারী ইহুদীরা এই জওয়াব শুনে সন্তুষ্ট হয়ে যায়। তারা আর অতিরিক্ত কোন প্রশ্ন করেনি যে, তার নাম কেন যুলকারনাইন ছিল এবং তিনি কোন্ দেশে কোন যুগে বিদ্যমান ছিলেন? এতে বোঝা যায় যে, এসব প্রশ্নকে স্বয়ং ইহুদীরাও অনাবশ্যক ও অনর্থক মনে করেছে। বলা বাহুল্য, কোরআন পাক ইতিহাস ও কাহিনীর ততটুকু অংশই উল্লেখ করে, যতটুকুর সাথে কোন ধর্মীয় বা পার্থিব উপকার জড়িত থাকে অথবা যার উপর কোন জরুরী বিষয় জানা নির্ভরশীল থাকে। তাই এসব বিষয় কোরআন পাক বর্ণনা করেনি এবং কোন সহীহ হাদীসেও এসব প্রশ্নের উত্তর নেই। যেহেতু কোরআন পাকের কোন আয়াত বোঝা এ গুলোর উপর নির্ভরশীল নয়, তাই পূর্ববর্তী সাহাবী ও তাবেয়ীগণও এসব বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেননি।

এখন এসব প্রশ্ন সমাধানের একমাত্র সম্বল হচ্ছে ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত অথবা বর্তমান তওরাত ও ইঞ্জীল। বলা বাহুল্য, উপর্যুপরি পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফলে বর্তমান তওরাত এবং ইঞ্জীলও তাদের ঐশী গ্রন্থের মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। এগুলো এখন বলতে গেলে ইতিহাস গ্রন্থের পর্যায়ভুক্ত। এগুলো বর্তমানে প্রাচীন ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত এবং ইসরাঈলী কিস্‌সা-কাহিনীতে পরিপূর্ণ। এসব কাহিনীর কোন সনদ নেই এবং কোন যমানার সুধীবৃন্দের কাছেও এগুলো নির্ভরযোগ্য পরিগণিত হয়নি। তফসীরবিদগণও এ ব্যাপারে যা কিছু লিখেছেন, তাও এক ধরনের ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতের সমষ্টি মাত্র। ফলে তাদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই। বর্তমানকালে ইউরোপীয়রা ইতিহাসকে অত্যধিক গুরুত্ব দান করেছে। তারা এ বিষয়ের গবেষণায় অপরিসীম অধ্যবসায় ও পরিশ্রম নিয়োজিত করেছে। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খনন করে সেখান থেকে বিভিন্ন শিলালিপি উদ্ধার করেছে এবং সেগুলোর সাহায্যে পুরাতত্ত্বের স্বরূপ আবিষ্কারে অভূত-

পূর্ব কৃতিত্ব অর্জন করেছে। কিন্তু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খনন করে প্রাপ্ত শিলালিপির মাধ্যমে কোন ঘটনার সমর্থনে সাহায্য পাওয়া গেলেও সেগুলো দ্বারা ঘটনার পাঠোদ্ধার সম্ভবপর নয়। এর জন্য ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত সমূহই ভিত্তি হতে পারে। এসব ব্যাপারে প্রাচীন-কালের ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত সমূহের অবস্থা একটু আগেই জানা গেছে যে, এ গুলোর মর্যাদা কিস্সা-কাহিনীর চাইতে অধিক নয়। প্রাচীন ও আধুনিক তফসীরবিদগণও স্ব-স্ব গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই উদ্ধৃত করেছেন। এখানেও এ দৃষ্টি-ভঙ্গিতেই যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু লেখা হচ্ছে। মাওলানা হিফযুর রহমান সাহেব 'কিসাসুল-কোরআন' গ্রন্থে এ ঘটনার পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। ইতিহাসের কৌতূহলী পাঠক সেখানে দেখে নিতে পারেন।

কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, সমগ্র বিশ্বে শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠাকারী চারজন সম্রাট অতিক্রান্ত হয়েছেন। তন্মধ্যে দু'জন ছিলেন মু'মিন এবং দু'জন কাফির। মু'মিন দু'জন হলেন হযরত সোলায়মান (আ) ও যুলকারনাইন এবং কাফির দু'জন নমরূদ ও বখতে নসর।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যুলকারনাইন নামে পৃথিবীতে একাধিক ব্যক্তি খ্যাতি লাভ করেছেন এবং এটাও আশ্চর্যের ব্যাপার যে, প্রতি যুগের যুলকারনাইনের সাথে সিকান্দর (আলেকজাণ্ডার) উপাধিটিও যুক্ত রয়েছে।

খৃস্টের প্রায় তিনশ' বছর পূর্বে সিকান্দার নামে একজন সম্রাট প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিলেন। তাকে সিকান্দার গ্রীক, মকদুনী, রূমী, ইত্যাদি উপাধিতেও স্মরণ করা হত। তার মন্ত্রী ছিলেন এরিস্টটল এবং তিনি দারার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করে তার রাজ্য জয় করেন। সিকান্দার নামে খ্যাতিলাভকারী সর্বশেষ ব্যক্তি তিনিই ছিলেন। তার কাহিনী জগতে অধিক প্রসিদ্ধ। কেউ কেউ তাকেও কোরআনে উল্লিখিত যুলকার-নাইন বলে অভিমত দিয়েছেন। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেননা তিনি অগ্নিপূজারি মুশরিক ছিলেন। কোরআন পাকে যে যুলকারনাইনের উল্লেখ রয়েছে, তার নবী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, কিন্তু ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। কোরআনের আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

হাফেজ ইবনে কাসীর 'আল বেদায়াহ ওয়ান্নেহায়াহ্' গ্রন্থে ইবনে আসাকিরের বরাত দিয়ে তার পূর্ণ বংশতালিকা লিপিবদ্ধ করেছেন, যা উপরে পৌঁছে হযরত ইব্রাহীম (আ) এর সাথে মিলে যায়। তিনি বলেছেন ঃ এই সিকান্দারই গ্রীক, মিসরী, মকদুনী নামে পরিচিত। তিনি নিজের নামে আলেকজান্দ্রিয়া শহর পত্তন করেন। রোমের ইতিহাস তার আমল থেকেই আরম্ভ হয়। তার আমল প্রথম সিকান্দার যুলকারনাইন থেকে দু'হাজার বছরেরও অধিককাল পর। তিনিই দারাকে হত্যা করেন এবং পারস্য সম্রাটদেরকে পরাভূত করে তাদের দেশ জয় করেন। কিন্তু এই ব্যক্তি ছিল মুশরিক। তাকে কোরআনে উল্লিখিত যুলকারনাইন বলা নিতান্তই ভুল। ইবনে কাসীরের ভাষা এরূপ ঃ

فاما ذوالقرنين الثانى فهو اسكندر بن فيلبس بن مصريم بن هرمس بن ميطون بن رومى بن لنطى بن يونان بن يافث بن يونة بن شرخون بن رومة بن شرفط بن توفيل بن رومى بن الاصفر بن يقز بن العيص بن اسحاق بن ابراهيم الخليل عليه الصلوة والسلام كذا نسبه الحافظ ابن عساكر فى تاريخه المقدونى اليونانى المصرى بانى اسكندرية الذى يورخ بايامه الروم وكان متأخرا عن الاول بدهر طويل وكان هذا قبل المسيح بنحو من ثلثمائة سنة وكان ارطاطاليس الفليسوف وزيره وهو الذى قتل دارا بن دارا واذل ملوك الفرس واوطا ارضهم وانما نبهنا عليه لان كثيرا من الناس يعتقد انهما واحد وان المذكور فى القران هو الذى كان ارطاطاليس وزيره فيقع بسبب ذلك خطاء كبير وفساد عريض طويل فان الاول كان عبدا مؤمنا صالحا وملكا عادلا وكان وزيره الخضر وقد كان نبيا على ما قررناه قبل هذا واما الثانى فكان مشركا كان وزيره فيلسوفا وقد كان بين زمانيهما ازيد من الفى سنة فاين هذا من هذا لا يستويان ولا يشتبهان الا على غبى لا يعرف حقائق الامور۔

হাদীস ও ইতিহাসবিদ ইবনে কাসীরের এই বক্তব্যে প্রথমত জানা গেল যে, সিকান্দার বাদশাহ যিনি ঈসা (আ)-র তিন শত বছর পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছেন, দারা ও পারস্য সম্রাটদের সাথে যাঁর যুদ্ধ হয়েছে এবং যিনি আলেকজান্দ্রিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি কোরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন নন। কতিপয় বড় বড় তফসীরবিদও এই বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন। আবূ হাইয়্যান বাহ্‌রে-মুহীতে এবং আল্লামা আলূসী রূহুল মা'আনীতে তাকে কোরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন বলে দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত وانه كان نبيا বাক্য থেকে জানা গেল যে, ইবনে কাসীরের মতে তাঁর নবী হওয়ার ধারণাটি প্রবল। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের উক্তি স্বয়ং ইবনে কাসীর আবু তোফায়েলের রেওয়ায়েতক্রমে হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যুলকারনাইন নবী বা ফেরেশতা ছিলেন না ; বরং একজন সৎ কর্মপরায়ণ মুসলমান ছিলেন। তাই কোন কোন আলিম বলেছেন যে, انه এর সর্বনাম দ্বারা যুলকারনাইনকে নয়---খিযির (আ) কে বোঝানো হয়েছে।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, তবে কোরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন কে এবং কোন্ যুগে ছিলেন? এ সম্পর্কেও আলিমদের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইবনে কাসীরের মতে তাঁর আমল ছিল সিকান্দার গ্রীক মকদুনী থেকে দু'হাজার বছর পূর্বে হযরত ইব্রাহীম (আ)-

এর আমল। তার উজির ছিলেন হযরত খিযির (আ)। ইবনে কাসীর 'আলবেদায়াহ্ ওয়ান্নেহায়াহ্' গ্রন্থে এ রেওয়ায়েতও বর্ণনা করেছেন যে, যুলকারনাইন পদব্রজে হজ্বের উদ্দেশে আগমণ করলে হযরত ইব্রাহীম (আ) মক্কা থেকে বের হয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানান, তার জন্য দোয়া করেন এবং কিছু উপদেশও প্রদান করেন। তফসীর ইবনে কাসীরে আয-রক্কীর বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে যে, যুলকারনাইন ইব্রাহীম (আ)-এর সাথে তওয়াফ করেন এবং কুরবানি করেন।

আবূ রায়হান আল-বেরুনী 'কিতাবুল আসরিল বাকীয়া আনিল কুরূনিল খালীয়া' গ্রন্থে বলেনঃ কোরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন হচ্ছে আবূ বকর ইবনে সুমাই ইবনে উমর ইবনে আফরীকায়স হিমইয়ারী। তিনি দিগ্বিজয়ী ছিলেন। তুব্বা হিমইয়ারী ইয়ামেনী তার কবিতায় তার জন্য গর্ববোধ করে বলেছেনঃ আমার দাদা যুলকারনাইন মুসলমান ছিলেন। কবিতা এইঃ

قد كان ذو القرنين جدى مسلما
ملكا علا فى الارض غير مبعد
بلغ المشارق والمغارب يبتغى
اسباب ملك من كريم سيد

আবূ হাইয়্যান বাহ্‌রেমুহীতে এ রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীরও 'আল-বেদায়াহ্ ওয়ান্নেহায়াহ্' গ্রন্থে এর উল্লেখ করার পর বলেনঃ এই যুলকারনাইন তিন জন ইয়ামনী সম্রাটের মধ্যে প্রথম সম্রাট ছিলেন। সে-ই সাবা' কূপের মোকদ্দমায় হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর পক্ষে ন্যায় ফয়সালা দিয়েছিলেন। এ সমুদয় রেওয়ায়েতে যুলকারনাইনের ব্যক্তিত্ব, নাম ও বংশ পরম্পরা সংক্রান্ত মতভেদ সত্ত্বেও তার আমল হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর আমল বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

মওলানা হিফযুর রহমান কিসাসুল কোরআনে যুলকারনাইন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনার সারমর্ম এই যে, কোরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন হচ্ছেন পারস্যের সে সম্রাট, যাকে ইহুদীরা খোরাস, গ্রীকরা সায়রাস, পারসিকরা গোরশ এবং আরবরা কায়খসরু নামে অভিহিত করে। তার আমল ইব্রাহীম (আ)-এর অনেক পরে বনী ইসরাঈলের অন্যতম পয়গম্বর দানিয়াল (আ)-এর আমল বর্ণনা করা হয়। এ আমল দারার হত্যাকারী সিকান্দার মকদুনীর আমলের কাছাকাছি হয়ে যায়। কিন্তু মওলানা সাহেবও ইবনে কাসীর প্রমুখের ন্যায় কঠোর ভাষায় বিরোধিতা করে বলেছেন যে, যুলকারনাইন সে সিকান্দার মকদুনী হতে পারে না, যার উজির ছিলেন দার্শনিক এরিস্টটল। কারণ, তিনি ছিলেন মুশরিক এবং যুলকারনাইন ছিলেন মু'মিন, সৎ কর্মপরায়ণ।

মওলানা সাহেবের বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ এই যে, সূরা বনী ইসরাঈলে বনী ইসরাঈলের দু'বার দুষ্কর্ম ও হাঙ্গামায় লিপ্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করে দুই বারের শাস্তি বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। হাঙ্গামা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ

بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ

(অর্থাৎ তোমাদের হাঙ্গামার শাস্তিস্বরূপ আমি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কিছু সংখ্যক কঠোর যোদ্ধা বান্দাকে প্রেরণ করব। তারা তোমাদের ঘরে ঘরে অনুপ্রবেশ করবে।) এখানে কঠোর যোদ্ধা বলে বখতে নসর ও তার দলবলকে বোঝানো হয়েছে। তারা বায়তুল মোকাদ্দাসে চল্লিশ হাজার এবং কোন কোন রেওয়ায়েত মতে সত্তর হাজার ইহুদীকে হত্যা করে এবং লক্ষাধিক বনী ইসরাঈলকে বন্দী করে গরু-ছাগলের মত হাঁকিয়ে বাবেলে নিয়ে যায়। এরপর কোরআন পাক বলেন ঃ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ (অর্থাৎ আমি পুনরায় তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে জয়ী করলাম।) বিজয়ের এই ঘটনাটি সম্রাট কায়খসরু তথা খোরাসের হাতে সংঘটিত হয়। সে ছিল ঈমানদার, সৎকর্মপরায়ণ। সে বখতে নসরের মুকাবিলা করে বন্দী বনী ইসরাঈলকে তার অধিকার থেকে মুক্ত করে পুনরায় ফিলীস্তীনে পুনর্বাসিত করে এবং ধ্বংসস্তূপে পরিণত বায়তুল-মোকাদ্দাসকেও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। বায়তুল-মোকাদ্দাসের যেসব গুপ্তধন ও গুরুত্বপূর্ণ সাজসরঞ্জাম বখতে নসর এখান থেকে বাবেলে স্থানান্তরিত করেছিল, সে সেগুলোও উদ্ধার করে বনী ইসরাঈলের অধিকারে সমর্পণ করে। এভাবে সে বনী ইসরায়ীলের কথা ইহুদীদের ত্রাণকর্তারূপে পরিগণিত হয়।

নবুয়ত পরীক্ষা করার জন্য মদীনার ইহুদীরা কোরায়শদের জন্য যে প্রশ্নপত্র বাছাই করে, তাতে যুলকারনাইন সম্পর্কিত প্রশ্নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ইহুদীরা তাকে তাদের ত্রাণকর্তারূপে সম্মান ও ভক্তিশ্রদ্ধা করত।

মওলানা হিফযুর রহমান সাহেব তাঁর এ বক্তব্যের স্বপক্ষে বর্তমান তওরা'ত থেকে, বনী ইসরাঈলের পয়গম্বরগণের ভবিষ্যদ্বাণী থেকে এবং ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত থেকে প্রচুর দলীল-প্রমাণ পেশ করেছেন। কেউ আরও বেশি জানতে চাইলে মওলানা সাহেবের পুস্তকটি পাঠ করতে পারেন। এসব রেওয়ায়েত উল্লেখ করার মাধ্যমে যুলকারনাইনের ব্যক্তিত্ব ও তার যুগ সম্পর্কে ইতিহাস ও তফসীরবিদদের সবগুলো উক্তি বর্ণনা করে দেওয়াই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। তন্মধ্যে কার উক্তি প্রবল, এ সিদ্ধান্ত নেওয়া আমার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা কোরআন যেসব বিষয়ের দাবি করেনি এবং হাদীসও যেসব বিষয় বর্ণনা করেনি, সেগুলো নির্ণয় ও নির্দিষ্ট করার দায়িত্বও আমার উপর বর্তায় না। তন্মধ্যে যে উক্তিই প্রবল ও নির্ভুল প্রমাণিত হবে, তাতেই কোরআনের লক্ষ্য অর্জিত হবে। والله اعلم এখন আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন ঃ

قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا—এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, কোরআন পাক ذِكْرَهٗ সংক্ষিপ্ত শব্দ ছেড়ে مِنْهُ ذِكْرًا এ দু'টি শব্দ কেন ব্যবহার করল?

চিন্তা করলে দেখতে পাবেন, এ দু'টি শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কোরআন পাক যুলকারনাইনের আদ্যপ্রান্ত কাহিনী বর্ণনা করার ওয়াদা করেনি; বরং তার আলোচনার একাংশ উল্লেখ করার কথা বলেছে। উপরে যুলকারনাইনের নাম ও বংশ পরম্পরা সম্পর্কে যে ঐতিহাসিক আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, কোরআন পাক একে অনাবশ্যক মনে করে বাদ দেওয়ার কথা প্রথমেই ঘোষণা করে দিয়েছে।

وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا---আরবী অভিধানে سبب শব্দের অর্থ এমন বস্তু যদ্দ্বারা লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য নেওয়া হয়। যন্ত্রপাতি, বৈষয়িক উপায়াদি, জ্ঞানবুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত।---(বাহ্‌রে মুহীত)

রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থার জন্য একজন সম্রাট ও রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে যেসব বিষয় অত্যাবশ্যকীয়, مِنْ كُلِّ شَيْءٍ বলে সেগুলোই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যুলকারনাইনকে ন্যায়বিচার, শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও দেশ বিজয়ের জন্য সে যুগে যেসব বিষয় প্রয়োজনীয় ছিল, সবই দান করেছিলেন।

فَأَتْبَعَ سَبَبًا---অর্থাৎ সব রকম ও দুনিয়ার সর্বত্র পৌঁছার উপকরণাদি তাকে দান করা হয়েছিল, কিন্তু সে সর্বপ্রথম পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছার উপকরণাদি কাজে লাগায়।

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ---অর্থাৎ তিনি পশ্চিম প্রান্তে সে সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন, যার পরে কোন জনবসতি ছিল না।

فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ---حَمِئَةٌ-এর শাব্দিক অর্থ কালো জলাভূমি অথবা কাদা। এখানে সে জলাশয়কে বোঝানো হয়েছে, যার নিচে কালো রঙের কাদা থাকে। ফলে পানির রঙও কালো দেখায়। সূর্যকে এরূপ জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখার অর্থ এই যে, দর্শক মাত্রই অনুভব করে যে, সূর্য এই জলাশয়ে অস্ত যাচ্ছে। কেননা এরপর কোন বসতি অথবা স্থলভাগ ছিল না। আপনি যদি সূর্যাস্তের সময় এমন কোন ময়দানে উপস্থিত থাকেন যার পশ্চিম দিকে দূরদূরান্ত পর্যন্ত কোন পাহাড়, বৃক্ষ, দালান-কোঠা ইত্যাদি না থাকে, তবে আপনার মনে হবে যেন সূর্যটি মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে।

وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا---অর্থাৎ ঐ কালো জলাশয়ের কাছে যুলকারনাইন এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আয়াতের পরবর্তী অংশ থেকে জানা যায় যে, সম্প্রদায়টি ছিল কাফির। তাই আল্লাহ্ তা'আলা যুলকারনাইনকে ক্ষমতা দান করলেন যে,

তুমি ইচ্ছা করলে প্রথমেই সবাইকে তাদের কুফরের শাস্তি প্রদান কর এবং ইচ্ছা করলে তাদের সাথে সদয় ব্যবহার কর; অর্থাৎ প্রথমে দাওয়াত, তবলীগ ও উপদেশের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলাম ও ঈমান কবূল করতে সম্মত কর। এরপর যারা মানে, তাদেরকে প্রতিদান এবং যারা না মানে তাদেরকে শাস্তি দাও। প্রত্যুত্তরে যুলকারনাইন দ্বিতীয় পথই অবলম্বন করে বললেন ঃ আমি প্রথমে তাদেরকে উপদেশের মাধ্যমে সরল-পথে আনার চেষ্টা করব। এরপরও যারা কুফরে দৃঢ়পদ থাকবে, তাদেরকে শাস্তি দেব। পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সৎকর্ম করবে, তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব।

قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ --এ থেকে জানা যায় যে, যুলকারনাইনকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই সম্বোধন করে এ কথা বলেছেন। যুলকারনাইনকে নবী সাব্যস্ত করা হলে এতে কোন প্রশ্ন দেখা দেয় না যে, ওহীর মাধ্যমেই তাঁকে বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁকে নবী না মানলে কোন পয়গম্বরের মধ্যস্থতায়ই তাঁকে এই সম্বোধন করা হয়ে থাকবে। যেমন, রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত খিযির (আ) তাঁর সাথে ছিলেন। এছাড়া এটা নবুয়তের ওহী না হয়ে আভিধানিক ওহী হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে; যেমন হযরত মূসা (আ)-র জননীর জন্য কোরআনে وَأَوْحَيْنَا বলা হয়েছে। অথচ তিনি যে নবী ও রসূল ছিলেন না, সেকথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আবূ হাইয়্যান বাহ্‌রে মুহীতে বলেন ঃ এখানে যুলকারনাইনকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে হত্যা ও শাস্তির আদেশ। এ ধরনের আদেশ নবুয়তের ওহী ব্যতীত দেওয়া যায় না ---কাশ্‌ফ, ইলহাম অথবা অন্য কোন উপায়ে তা হতে পারে না। তাই, হয় যুলকারনাইনকে নবী মানতে হবে, না হয় তাঁর আমলে একজন নবীর উপস্থিতি স্বীকার করতে হবে, যাঁর মাধ্যমে তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে। এছাড়া অন্য কোন সম্ভাবনাই বিশুদ্ধ নয়।

ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾ حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى
قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا ﴿٩٠﴾ كَذٰلِكَ ۚ وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ
خُبْرًا ﴿٩١﴾

---

(৮৯) অতঃপর তিনি এক উপায় অবলম্বন করলেন। (৯০) অবশেষে তিনি যখন সূর্যের উদয়াচলে পৌঁছলেন, তখন তিনি তাকে এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হতে দেখলেন, যাদের জন্য সূর্যতাপ থেকে আত্মরক্ষার কোন আড়াল আমি সৃষ্টি করিনি। (৯১) প্রকৃত ঘটনা এমনিই। তার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর (পশ্চিমের দেশসমূহ জয় করার পর প্রাচ্যদেশসমূহ জয় করার ইচ্ছায় প্রাচ্যের দিকে) তিনি এক পথ ধরলেন। অবশেষে যখন সূর্যের উদয়াচলে (অর্থাৎ পূর্ব-দিকে জনবসতির শেষ প্রান্তে) পৌঁছলেন, তখন সূর্যকে এমন জাতির উপর উদয় হতে দেখলেন, যাদের জন্য আমি সূর্যের তাপ থেকে আত্মরক্ষার কোন আড়াল রাখিনি। (অর্থাৎ সেখানে এমন এক জাতি বাস করত, যারা রৌদ্র-কিরণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য কোন গৃহ অথবা তাঁবু নির্মাণে অভ্যস্ত ছিল না; বরং তারা সম্ভবত পোশাক-পরিচ্ছদও পরিধান করত না। জন্তু-জানোয়ারের মত উন্মুক্ত মাঠে বসবাস করত।) এ ব্যাপারটি এমনিই। যুলকারনাইনের কাছে যা কিছু (আসবাবপত্র) ছিল, আমি তার বৃত্তান্ত সম্যক অবগত আছি। [এতে নবুয়ত পরীক্ষার্থে যুলকারনাইন সম্পর্কে প্রশ্নকারীদেরকে এ বিষয়ে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, আমি যা কিছু বলছি তা সঠিক জ্ঞান ও অবগতির ভিত্তিতেই বলছি; সাধারণ ঐতিহাসিক গল্প নয়। এতে মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়তের সত্যতা ফুটে উঠে।]

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যুলকারনাইন পূর্বপ্রান্তে যে জাতিকে বসবাস করতে দেখেছেন, কোরআন পাক তাদের সম্পর্কে বলেছে যে, তারা গৃহ, তাঁবু, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির দ্বারা রোদ থেকে আত্মরক্ষা করত না, কিন্তু তাদের ধর্ম ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে কিছুই বলেনি এবং যুলকারনাইন তাদের সাথে কি ব্যবহার করেছেন, তাও ব্যক্ত করেনি। বলাবাহুল্য, তারাও কাফিরই ছিল এবং যুলকারনাইন তাদের সাথেও এমন ব্যবহারই করেছেন, যা পশ্চিমা জাতির সাথে করেছেন বলে উপরে বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে তা বর্ণনা করার প্রয়োজন মনে করা হয়নি। কারণ, পূর্ববর্তী ঘটনার আলোকেই তা বোঝা যায়। (বাহ্‌রে মুহীত)

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا (৯২) حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا ۙ
لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (৯৩) قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ
مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا
وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (৯৪) قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ
أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا (৯৫) آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ
بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا ۙ قَالَ آتُونِي

أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۝٩٦ فَمَا اسْطَاعُوٓا أَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ۝٩٧ قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّيْ ۚ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا ۝٩٨

(৯২) আবার তিনি এক পথ ধরলেন। (৯৩) অবশেষে যখন তিনি দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যস্থলে পৌঁছলেন, তখন তিনি সেখানে এক জাতিকে পেলেন, যারা তার কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না। (৯৪) তারা বলল ঃ হে যুলকারনাইন, ইয়াজুজ ও মাজুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করছে। আপনি বললে আমরা আপনার জন্য কিছু কর ধার্য করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন। (৯৫) তিনি বললেন ঃ আমার পালনকর্তা আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট। অতএব তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব। (৯৬) তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও। অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক। অবশেষে যখন তা আগুনে পরিণত হল, তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা গলিত তামা নিয়ে এস, আমি তা এর উপরে ঢেলে দিই। (৯৭) অতঃপর ইয়াজুজ ও মাজুজ তার উপরে আরোহণ করতে পারল না এবং তা ভেদ করতেও সক্ষম হল না। (৯৮) যুলকারনাইন বললেন ঃ এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ। যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত সময় আসবে, তখন তিনি একে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি সত্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর (পশ্চিম ও পূর্বদেশ জয় করে) তিনি আরেক দিকে পথ ধরলেন। (কোরআন এ দিকের নাম উল্লেখ করেনি, কিন্তু জনবসতি অধিকতর উত্তরদিকে। তাই তফসীরবিদগণ একে উত্তর দেশসমূহের সফর স্থির করেছেন। ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণও এরই সমর্থন করে।) অবশেষে তিনি যখন দুই পর্বতের মধ্যস্থলে পৌঁছলেন, তখন সেখানে এক জাতিকে দেখতে পেলেন, যারা (ভাষা ও অভিধান সম্পর্কে অজ্ঞ মানবেতর জীবন-যাপনের কারণে) তাঁর কথা একবারেই বুঝত না। (এ থেকে জানা যায় যে, তারা শুধু ভাষা সম্পর্কেই অজ্ঞ ছিল না; কেননা বুদ্ধি-জ্ঞান থাকলে ভিন্নভাষীদের কথাবার্তাও ইশারা-ইঙ্গিতে বুঝে নেয়া যায়। বরং পাশব ও মানবেতর জীবন-যাপন পদ্ধতি তাদেরকে বুদ্ধিজ্ঞান থেকেও বঞ্চিত করে রেখেছিল। কিন্তু এরপর বোধ হয় কোন দোভাষীর সাহায্যে) তারা বলল ঃ হে যুলকারনাইন, ইয়াজুজ ও মাজুজ (যারা পর্বতশ্রেণীর অপরপার্শ্বে বাস করে, আমাদের এই) দেশে (মাঝে মাঝে এসে প্রচুর) অশান্তি সৃষ্টি করছে। (অর্থাৎ হত্যা ও লুণ্ঠন করছে। তাদের মুকাবিলা করার শক্তি আমাদের নেই। অতএব আমরা কি

আপনার জন্য চাঁদা করে কিছু অর্থ সঞ্চয় করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যস্থলে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন (যাতে তারা এদিকে আসতে না পারে) যুলকারনাইন বললেন ঃ আমার পালনকর্তা আমাকে যে আর্থিক সামর্থ্য দান করেছেন, তাই যথেষ্ট (কাজেই চাঁদা করে অর্থ যোগান দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই ;) তবে তোমরা আমাকে হাত-পায়ের শক্তি (অর্থাৎ শ্রম ও মজুরি) দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যস্থলে সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব। তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও, (মূল্য আমি দেব। বলা বাহুল্য, এ লৌহ প্রাচীর নির্মাণ করার জন্য হয়তো অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু এই মানবেতর জনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু এই মানবেতর জনের দেশে লৌহপাতই ছিল সবচাইতে দুর্লভ বস্তু। তাই শুধু এর কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। সাজসরঞ্জাম সংগৃহীত হওয়ার পর উভয় পাহাড়ের মধ্যস্থলে লৌহ প্রাচীর নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গেল।) অবশেষে যখন (প্রাচীরের স্তর সংযুক্ত করতে করতে দুই পাহাড়ের) দুই চূড়ার মধ্যবর্তী (ফাঁকা) স্থান (পাহাড়ের) সমান করে দেওয়া হল, তখন তিনি আদেশ করলেন ঃ তোমরা একে দগ্ধ করতে থাক। (দগ্ধ করা শুরু হল) অবশেষে যখন (দগ্ধ করতে করতে) তাকে আগুনের মত লাল অঙ্গার করে দিল, তখন তিনি আদেশ করলেন ঃ এখন আমার কাছে গলিত তামা (যা হয়তো পূর্বেই প্রস্তুত রাখা হয়েছিল) নিয়ে এসো, যাতে আমি তা এর উপরে ঢেলে দেই। (সেমতে গলিত তামা এনে যন্ত্রের সাহায্যে উপর থেকে ঢেলে দেওয়া হল, যাতে প্রাচীরের সব ফাঁকে প্রবেশ করে গোটা প্রাচীর একাকার হয়ে যায়। এই প্রাচীরের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন।) অতঃপর (উচ্চতা ও মসৃণতার কারণে) ইয়াজুজ-মাজুজ তার উপরে আরোহণ করতে পারল না এবং (চূড়ান্ত শক্ত হওয়ার কারণে) তাতে কোন ছিদ্র করতে সক্ষম হল না। যুলকারনাইন (যখন প্রাচীরটিকে প্রস্তুত দেখলেন এবং এর নির্মাণ সম্পন্ন হওয়া যেহেতু কোন সহজ কাজ ছিল না, তখন কৃতজ্ঞতা স্বরূপ) বললেন ঃ এটা আমার পালনকর্তার একটি অনুগ্রহ (আমার প্রতিও ; কারণ আমার হাতে এটা সম্পন্ন হয়েছে এবং এই জাতির প্রতিও, যাদেরকে ইয়াজুজ-মাজুজ বিব্রত করত) অতঃপর যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত সময় আসবে, (অর্থাৎ এর ধ্বংসের সময় আসবে) তখন একে বিধ্বস্ত করে মাটির সমান করে দেবেন। আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি সত্য।---(সময় আসলে তা অবশ্যই পূর্ণ হয়।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শব্দার্থ ঃ بَيْنَ السَّدَّيْنِ যে বস্তু কোন কিছুর জন্য বাধা হয়ে যায়, তাকে سَدّ বলা হয় ; তা প্রাচীর হোক কিংবা পাহাড় হোক, কৃত্রিম হোক কিংবা প্রাকৃতিক হোক। এখানে سدين বলে দুই পাহাড় বোঝানো হয়েছে। এগুলো ইয়াজুজ-মাজুজের

পথে বাধা ছিল। কিন্তু উভয়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ দিয়ে এসে তারা আক্রমণ চালাত। যুলকারনাইন এই গিরিপথটি বন্ধ করে দেন।

زُبَرَ الْحَدِيْدِ—زُبَرٌ- শব্দটি زُبْرَةٌ- এর বহুবচন। এর অর্থ পাত। এখানে লৌহখণ্ড বোঝানো হয়েছে। গিরিপথ বন্ধ করার জন্য নির্মিতব্য প্রাচীর ইট-পাথরের পরিবর্তে লোহার পাত ব্যবহার করা হয়েছিল।

الصَّدَفَيْنِ---দুই পাহাড়ের বিপরীতমুখী দুই দিক ঃ

قِطْرًا---অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এর অর্থ গলিত তামা। কারও কারও মতে গলিত লোহা অথবা রাঙতা।---(কুরতুবী)

دَكَّاءَ---অর্থাৎ যে বস্তু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে সমতল হয়ে যায়।

ইয়াজুজ-মাজুজ কারা এবং কোথায়? যুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত ঃ ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে ইসরাঈলী রেওয়ায়েত ও ঐতিহাসিক কিসসা-কাহিনীতে অনেক ভিত্তিহীন অলীক কথাবার্তা প্রচলিত রয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদও এগুলো ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু স্বয়ং তাঁদের কাছেও এগুলো নির্ভরযোগ্য নয়। কোরআন পাক তাদের সংক্ষিপ্ত অবস্থা বর্ণনা করেছে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্পর্কে উম্মতকে অবহিত করেছেন। ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপনের বিষয় ততটুকুই, যতটুকু কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তফসীর, হাদীস ও ইতিহাসবিদগণ এর অতিরিক্ত যেসব ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অবস্থা বর্ণনা করেছেন, সেগুলো বিশুদ্ধও হতে পারে এবং অশুদ্ধও হতে পারে। ইতিহাসবিদগণের বিভিন্নমুখী উক্তিগুলো নিছক ইঙ্গিত ও অনুমানের উপর ভিত্তিশীল। এগুলো শুদ্ধ কিংবা অশুদ্ধ হলেও তার কোন প্রভাব কোরআনের বক্তব্যের উপর পড়ে না।

আমি এখানে সর্বপ্রথম এ সম্পর্কিত সহীহ্ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলো উল্লেখ করছি। এরপর প্রয়োজন অনুসারে ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতও বর্ণনা করা হবে।

ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে হাদীসের বর্ণনা ঃ কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে এতটুকু নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ইয়াজুজ-মাজুজ মানব সম্প্রদায়ভুক্ত। অন্যান্য মানবের মত তারাও নূহ্ (আ)-এর সন্তান-সন্ততি। কোরআন পাক স্পষ্টতই বলেছে ঃ

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ---অর্থাৎ নূহের মহাপ্লাবনের পর দুনিয়াতে যত মানুষ আছে এবং থাকবে, তারা সবাই নূহ (আ)-এর সন্তান-সন্ততি হবে। ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত এ ব্যাপারে একমত যে, তারা ইয়াফেসের বংশধর। একটি দুর্বল হাদীস

থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তাদের অবশিষ্ট অবস্থা সম্পর্কে সর্বাধিক বিস্তারিত ও সহীহ্ হাদীস হচ্ছে হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রা)-এর হাদীসটি। এটি সহীহ্ মুসলিম ও অন্য সব নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। হাদীসবিদগণ একে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। এতে দাজ্জালের আবির্ভাব, ঈসা (আ)-র অবতরণ, ইয়াজুজ-মাজুজের অভ্যুত্থান ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণ উল্লিখিত আছে। হাদীসটির অনুবাদ নিম্নরূপ ঃ

হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন ভোর বেলা দাজ্জালের আলোচনা করলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি তার সম্পর্কে এমন কিছু কথা বললেন, যদ্দ্বারা মনে হচ্ছিল যে, সে নেহাতই তুচ্ছ ও নগণ্য ; (উদাহরণত সে কানা হবে।) পক্ষান্তরে কিছু কথা এমন বললেন, যদ্দ্বারা মনে হচ্ছিল যে, তার ফিতনা অত্যন্ত ভয়াবহ ও কঠোর হবে। (উদাহরণত জান্নাত ও দোযখ তার সাথে থাকবে এবং অন্যান্য আরও অস্বাভাবিক ও ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ঘটবে।) রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বর্ণনার ফলে (আমরা এমন ভীত হয়ে পড়লাম) যেন দাজ্জাল খর্জুর বৃক্ষের ঝাড়ের মধ্যেই রয়েছে। (অর্থাৎ অদূরেই বিরাজমান রয়েছে।) বিকালে যখন আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দরবারে উপস্থিত হলাম, তখন তিনি আমাদের মনের অবস্থা আঁচ করে নিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি বুঝেছ ? আমরা আরয করলাম ঃ আপনি দাজ্জালের আলোচনা প্রসঙ্গে এমন কিছু কথা বলেছেন, যাতে বোঝা যায় যে, তার ব্যাপারটি নেহাতই তুচ্ছ এবং আরও কিছু কথা বলেছেন, যাতে মনে হয়, সে খুব শক্তিসম্পন্ন হবে এবং তার ফিতনা হবে খুব গুরুতর। এখন আমাদের মনে হয়েছে, যেন সে আমাদের নিকটেই খর্জুর বৃক্ষের ঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তোমাদের সম্পর্কে আমি যেসব ফিতনার আশংকা করি, তন্মধ্যে দাজ্জালের তুলনায় অন্যান্য ফেতনা অধিক ভয়ের যোগ্য। (অর্থাৎ দাজ্জালের ফিতনা এতটুকু গুরুতর নয়, যতটুকু তোমরা মনে করছ।) যদি আমার জীবদ্দশায় সে আবির্ভূত হয়, তবে আমি নিজে তার মুকাবিলা করব। (কাজেই তোমাদের চিন্তান্বিত হওয়ার কোন কারণ নেই।) পক্ষান্তরে সে যদি আমার পরে আসে, তবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে পরাভূত করার চেষ্টা করবে। আমার অনুপস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানের সাহায্যকারী। (তার লক্ষণ এই যে) সে যুবক, ঘন কোঁকড়ানো চুলওয়ালা হবে। তার একটি চক্ষু উপরের দিকে উত্থিত হবে (এবং অপর চক্ষুটি হবে কানা।) যদি আমি (কুৎসিত চেহারার) কোন ব্যক্তিকে তার সাথে তুলনা করি, তবে সে হচ্ছে আবদুল ওযযা ইবনে-কুত্না। (জাহেলিয়াত আমলে কুৎসিত চেহারায় 'বনু-খোযাআ' গোত্রের এ লোকটির তুলনা ছিল না।) যদি কোন মুসলমান দাজ্জালের সম্মুখীন হয়ে যায়, তবে সূরা কাহ্ফের প্রথম আয়াতগুলো পড়ে নেওয়া উচিত। (এতে সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে।) দাজ্জাল সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থান থেকে বের হয়ে চতুর্দিকে হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে। হে আল্লাহ্‌র বান্দারা, তোমরা তার মুকাবিলায় সুদৃঢ় থাক।

আমরা আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, সে কতদিন থাকবে ? তিনি বললেন ঃ সে চল্লিশ দিন থাকবে, কিন্তু প্রথম দিন এক বছরের সমান হবে। দ্বিতীয় দিন এক মাসের

এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। অবশিষ্ট দিনগুলো সাধারণ দিনের মতই হবে। আমরা আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ, যে দিনটি এক বছরের সমান হবে, আমরা কি তাতে শুধু এক দিনের (পাঁচ ওয়াক্ত) নামাযই পড়ব? তিনি বললেনঃ না; বরং সময়ের অনুমান করে পূর্ণ এক বছরের নামায পড়তে হবে। আমরা আবার আরয করলামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, সে কেমন দ্রুতগতিতে সফর করবে? তিনি বললেনঃ সে মেঘখণ্ডের মত দ্রুত চলবে, যার পেছনে অনুকূল বাতাস থাকে। দাজ্জাল কোন সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে তাকে মিথ্যা ধর্মবিশ্বাসের প্রতি দাওয়াত দেবে। তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলে সে মেঘমালাকে বর্ষণের আদেশ দেবে। ফলে বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং মাটিকে আদেশ দেবে; ফলে সে শস্যশ্যামলা হয়ে যাবে। (তাদের চতুষ্পদ জন্তু তাতে চরবে।) সন্ধ্যায় যখন জন্তুগুলো ফিরে আসবে, তখন তাদের কুঁজ পূর্বের তুলনায় উঁচু হবে এবং স্তন দুধে পরিপূর্ণ থাকবে। এরপর দাজ্জাল অন্য সম্প্রদায়ের কাছে যাবে এবং তাদেরকেও কুফরের দাওয়াত দেবে। কিন্তু তারা তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করবে। সে নিরাশ হয়ে ফিরে গেলে সেখানকার মুসলমানরা দুর্ভিক্ষে পতিত হবে। তাদের কাছে কোন অর্থকড়ি থাকবে না! সে শস্যবিহীন অনুর্বর ভূমিকে সম্বোধন করে বলবেঃ তোর গুপ্তধন বাইরে নিয়ে আয়। সেমতে ভূমির গুপ্তধন তার পেছনে পেছনে চলবে; যেমন মৌমাছিরা তাদের সরদারের পেছনে পেছনে চলে। অতঃপর দাজ্জাল একজন ভরপুর যুবক ব্যক্তিকে ডাকবে এবং তাকে তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে দেবে। তার উভয় খণ্ড এতটুকু দূরত্বে রাখা হবে; যেমন তীর নিক্ষেপকারী ও তার লক্ষ্যবস্তুর মাঝখানে থাকে। অতঃপর সে তাকে ডাক দেবে! সে (জীবিত হয়ে) দাজ্জালের কাছে প্রফুল্ল চিত্তে চলে আসবে। ইতিমধ্যে আল্লাহ্ তা'আলাই হযরত ঈসা (আ)-কে নামিয়ে দিবেন। তিনি দু'টি রঙিন চাদর পরে দামেস্ক মসজিদের পূর্ব দিককার সাদা মিনারে ফেরেশতাদের পাখার উপর পা রেখে অবতরণ করবেন। তিনি যখন মস্তক অবনত করবেন, তখন তা থেকে পানির ফোঁটা পড়বে। (মনে হবে যেন এখনই গোসল করে এসেছেন।) তিনি যখন মস্তক উঁচু করবেন, তখনও মোমবাতির মত স্বচ্ছ পানির ফোঁটা পড়বে। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস যে কাফিরের গায়ে লাগবে, সে সেখানেই মরে যাবে। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস তাঁর দৃষ্টির সমান দূরত্বে পৌঁছাবে। হযরত ঈসা (আ) দাজ্জালকে খুঁজতে খুঁজতে বাবুল্লুদ্দে গিয়ে তাকে ধরে ফেলবেন। (এই জনপদটি এখনও বায়তুল মোকাদ্দাসের অদূরে এ নামেই বিদ্যমান।) সেখানে তাকে হত্যা করবেন। এরপর তিনি জনসমক্ষে আসবেন, স্নেহভরে মানুষের চেহারায় হাত বুলাবেন এবং তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদার সুসংবাদ শোনাবেন।

এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করবেনঃ আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে এমন লোক বের করব যাদের মুকাবিলা করার শক্তি কারও নেই। কাজেই আপনি মুসলমানদেরকে সমবেত করে তূর পর্বতে চলে যান। (সেমতে তিনিই তাই করবেন।) অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াজুজ-মাজুজের রাস্তা খুলে দেবেন। তাদের দ্রুত চলার কারণে মনে হবে যেন উপর থেকে পিছলে নিচে এসে পড়ছে। তাদের

প্রথম দলটি তবরিয়া উপসাগরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তার পানি পান করে এমন অবস্থা করে দেবে যে, দ্বিতীয় দলটি এসে সেখানে কোন দিন পানি ছিল, একথা বিশ্বাস করতে পারবে না।

ঈসা (আ) ও তাঁর সঙ্গীরা তূর পর্বতে আশ্রয় নেবেন। অন্য মুসলমানরা নিজ নিজ দুর্গে ও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেবে। পানাহারের বস্তুসামগ্রী সাথে থাকবে, কিন্তু তাতে ঘাটতি দেখা দেবে। ফলে একটি গরুর মস্তককে একশ দীনারের চাইতে উত্তম মনে করা হবে। হযরত ঈসা (আ) ও অন্য মুসলমানরা কষ্ট লাঘবের জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করবেন। (আল্লাহ্ দোয়া কবুল করবেন।) তিনি মহামারী আকারে রোগ-ব্যাধি পাঠাবেন। ফলে অল্পসময়ের মধ্যে ইয়াজুজ-মাজুজের গোষ্ঠী সবাই মরে যাবে। অতঃপর ঈসা (আ) সঙ্গীদেরকে নিয়ে তূর পর্বত থেকে নিচে নেমে এসে দেখবেন পৃথিবীতে তাদের মৃতদেহ থেকে অর্ধ হাত পরিমিত স্থানও খালি নেই এবং (মৃতদেহ পচে) অসহ্য দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। (এ অবস্থা দেখে পুনরায়) হযরত ঈসা (আ) ও তাঁর সঙ্গীরা আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করবেন (যেন এই বিপদও দূর করে দেয়া হয়।) আল্লাহ্ তা'আলা এ দোয়াও কবুল করবেন এবং বিরাটাকার পাখী প্রেরণ করবেন, যাদের ঘাড় হবে উটের ঘাড়ের মত। (মৃতদেহগুলো উঠিয়ে যেখানে আল্লাহ্ ইচ্ছা করবেন, সেখানে ফেলে দেবে।) কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে মৃতদেহগুলো সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। এরপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে। কোন নগর ও বন্দর এ বৃষ্টি থেকে বাদ থাকবে না। ফলে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ ধৌত হয়ে কাঁচের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে আদেশ করবেনঃ তোমার পেটের সমুদয় ফল-ফুল উদ্গিরণ করে দাও এবং নতুনভাবে তোমার বরকতসমূহ প্রকাশ কর। (ফলে তাই হবে এবং এমন বরকত প্রকাশিত হবে যে,) একটি ডালিম একদল লোকের আহারের জন্য যথেষ্ট হবে এবং মানুষ তার ছাল দ্বারা ছাতা তৈরি করে ছায়া লাভ করবে। দুধে এত বরকত হবে যে, একটি উষ্ট্রির দুধ একদল লোকের জন্য, একটি গাভীর দুধ এক গোত্রের জন্য এবং একটি ছাগলের দুধ একটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে। (চল্লিশ বছর যাবত এই অসাধারণ বরকত ও শান্তিশৃঙ্খলা অব্যাহত থাকার পর যখন কিয়ামতের সময় সমাগত হবে; তখন) আল্লাহ্ তা'আলা একটি মনোরম বায়ু প্রবাহিত করবেন। এর পরশে সব মুসলমানের বগলের নিচে বিশেষ এক প্রকার রোগ দেখা দেবে এবং সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হবে; শুধু কাফির ও দুষ্ট লোকেরাই অবশিষ্ট থেকে যাবে। তারা ভূপৃষ্ঠে জন্তু-জানোয়ারের মত খোলাখুলি অপকর্ম করবে। তাদের উপরই কিয়ামত আসবে।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদের রেওয়ায়েতে ইয়াজুজ-মাজুজের কাহিনীর আরও অধিক বিবরণ পাওয়া যায়। তাতে রয়েছেঃ তবরিয়া উপসাগর অতিক্রম করার পর ইয়াজুজ-মাজুজ বায়তুল মোকাদ্দাস সংলগ্ন পাহাড় জাবালুল-খমরে আরোহণ করে ঘোষণা করবে; আমরা পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীকে হত্যা করেছি। এখন আকাশের অধিবাসীদেরকে খতম করার পালা। সেমতে তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে।

আল্লাহ্‌র আদেশে সে তীর রক্তরঞ্জিত হয়ে তাদের কাছে ফিরে আসবে (যাতে বোকারা এই ভেবে আনন্দিত হবে যে, আকাশের অধিবাসীরাও শেষ হয়ে গেছে।)

দাজ্জালের কাহিনী প্রসঙ্গে হযরত আবূ সাঈদ খুদরীর রেওয়ায়েতে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, দাজ্জাল মদীনা মুনাওয়ারা থেকে দূরে থাকবে। মদীনার পথসমূহে আসাও তার পক্ষে সম্ভব হবে না। সে মদীনার নিকটবর্তী একটি লবণাক্ত ভূমিতে আগমন করবে। তখন সমসাময়িক এক মহান ব্যক্তি তার কাছে এসে বলবেন ঃ আমি পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে বলছি যে, তুই সে দাজ্জাল যার সংবাদ রসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে দিয়েছিলেন। (একথা শুনে) দাজ্জাল বলবে ঃ লোক সকল! যদি আমি এ ব্যক্তিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করে দেই, তবে আমি যে খোদা এ ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ করবে কি? সবাই উত্তর দেবে ঃ না। অতঃপর সে লোকটিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করে দিবে। লোকটি জীবিত হয়ে দাজ্জালকে বলবেন ঃ এবার আমার বিশ্বাস আরও বেড়ে গেছে যে, তুই-ই সে দাজ্জাল। দাজ্জাল তাকে পুনরায় হত্যা করতে চাইবে কিন্তু সমর্থ হবে না।---(মুসলিম)

সহীহ্ বোখারী ও মুসলিমে আবূ সাইদ খুদরীর বাচনিক বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে বলবেন, আপনি আপনার সন্তানদের মধ্য থেকে জাহান্নামীদেরকে তুলে আনুন। তিনি আরয করবেন, হে পরওয়ারদিগার তারা কারা? আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ প্রতি হাজারে নয় শত নিরানব্বই জন জাহান্নামী এবং মাত্র একজন জান্নাতী। একথা শুনে সাহবায়ে কিরাম শিউরে উঠলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমাদের মধ্যে সে একজন জান্নাতী কে হবে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ চিন্তা করো না। এই নয় শত নিরানব্বই জন জাহান্নামী তোমাদের মধ্য থেকে এক এবং ইয়াজুজ-মাজুজের মধ্য থেকে এক হাজারের হিসেবে হবে। মুস্তাদরাক হাকিমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের বাচনিক বর্ণিত রয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র মানবজাতিকে দশ ভাগে ভাগ করেছেন। তন্মধ্যে নয় ভাগে রয়েছে ইয়াজুজ-মাজুজের লোক আর অবশিষ্ট এক ভাগে সারা বিশ্বের মানুষ।---(রূহুল মা'আনী)

ইবনে-কাসীর 'আল বেদায়া ওয়ান্নেহায়াহ্' গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত উল্লেখ করে বলেন ঃ এতে বোঝা যায় যে, ইয়াজুজ-মাজুজের সংখ্যা সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যার চাইতে অনেক বেশি হবে।

মসনদ আহ্‌মদ ও আবূ দাউদে হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ ঈসা (আ) অবতরণের পর চল্লিশ বছর দুনিয়াতে অবস্থান করবেন। মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে সাতবছরের কথা বলা হয়েছে। 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে হাফেয ইবনে হাজার একে অশুদ্ধ সাব্যস্ত করে চল্লিশ বছর মেয়াদকেই শুদ্ধ বলেছেন। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এই দীর্ঘ সময় সুখ-শান্তিতে অতিবাহিত হবে এবং অসংখ্য বরকত প্রকাশ পাবে। পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও শত্রুতার লেশমাত্র থাকবে না। দু'ব্যক্তির মধ্যে কোন সময় ঝগড়া-বিবাদ হবে না।---(মুসলিম ও আহমদ)

বোখারী হযরত আবু সাঈদ খুদরীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণনা করেন যে, ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাবের পরও বায়তুল্লাহ্‌র হজ্ব ও ওমরা অব্যাহত থাকবে।--(মাযহারী)

বোখারী ও মুসলিম হযরত যয়নব বিনতে জাহশের রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন ঘুম থেকে এমন অবস্থায় জেগে উঠলেন যে, তাঁর মুখমণ্ডল ছিল রক্তিমাভ এবং মুখে এই বাক্য উচ্চারিত হচ্ছিল ঃ

لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم
ياجوج وماجوج مثل هذه وحلق تسعين -

"আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আরবদের ধ্বংস নিকটবর্তী। আজ ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে এতটুকু ছিদ্র হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী মিলিয়ে বৃত্ত তৈরি করে দেখান।

হযরত যয়নব (রা) বলেন ঃ একথা শুনে আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্, আমাদের মধ্যে সৎকর্মপরায়ন লোক জীবিত থাকতেও কি ধ্বংস হয়ে যাবে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, ধ্বংস হতে পারে, যদি অনাচারের আধিক্য হয়।---(আল বেদায়া ওয়ান্নেহায়াহ্) ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে বৃত্ত পরিমাণ ছিদ্র হয়ে যাওয়া আসল অর্থেও হতে পারে এবং রূপক হিসেবে প্রাচীরটি দুর্বল হয়ে যাওয়ার অর্থেও হতে পারে। ---(ইবনে কাসীর, আবু হাইয়্যান)

মসনদ আহ্‌মদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজা হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ইয়াজুজ-মাজুজ প্রত্যহ যুলকারনাইনের দেয়ালটি খুঁড়তে থাকে। খুঁড়তে খুঁড়তে তারা এ লৌহ প্রাচীরের প্রান্ত সীমার এত কাছাকাছি পৌঁছে যায় যে, অপরপার্শ্বের আলো দেখা যেতে থাকে। কিন্তু তারা এ কথা বলে ফিরে যায় যে, বাকী অংশটুকু আগামীকাল খুঁড়ব। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা প্রাচীরটিকে পূর্ববৎ মজবুত অবস্থায় ফিরিয়ে নেন। পরের দিন ইয়াজুজ-মাজুজ প্রাচীর খননে নতুনভাবে আত্মনিয়োগ করে। খননকার্যে আত্মনিয়োগ ও আল্লাহ্ পাক থেকে তা মেরামতের এ ধারা ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যতদিন ইয়াজুজ-মাজুজকে বন্ধ রাখা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা রয়েছে। যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা ওদেরকে মুক্ত করার ইচ্ছা করবেন, সেদিন ওরা মেহনত শেষে বলবে ঃ আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আমরা আগামীকাল অবশিষ্ট অংশটুকু খুঁড়ে উপারে চলে যাব। (আল্লাহ্‌র নাম ও তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করার কারণে সেদিন ওদের তওফীক হয়ে যাবে।) অতএব পরের দিন তারা প্রাচীরের অবশিষ্ট অংশকে তেমনি অবস্থায় পাবে এবং তারা সেটুকু খুঁড়েই প্রাচীর ভেদ করে ফেলবে। তিরমিযী এই রেওয়ায়েতটি ابو عوانة عن قتادة عن ابى رافع عن ابى هريرة সূত্রে বর্ণনা করে বলেন ঃ

غريب لانعرفه الا من هذا الوجه——ইবনে কাসীর তাঁর তফসীরে রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করে বলেন اسناده جيد قوى ولكن متنه فى رفعه نكارة — এর সনদ উত্তম ও শক্তিশালী, কিন্তু মূল বক্তব্যটি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কিনা, তা সুবিদিত নয়।

ইবনে-কাসীর 'আল-বেদায়া-ওয়ান্নেহায়াহ্' গ্রন্থে এ হাদীস সম্পর্কে বলেন ঃ যদি মেনে নেয়া হয় যে, হাদীসের মূল বক্তব্যটি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নয়; বরং কা'ব আহবারের বর্ণনা তবে এটা যে ধর্তব্য ও নির্ভরযোগ্য নয়, তা স্পষ্ট। পক্ষান্তরে যদি একে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বক্তব্য সাব্যস্ত করা হয়, তবে হাদীসের উদ্দেশ্য এই যে, ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর খনন করার কাজটি তখন শুরু হবে, যখন তাদের আবির্ভাবের সময় নিকটবর্তী হবে। কোরআনে বলা হয়েছে যে, এই প্রাচীর ছিদ্র করা যাবে না এটা তখনকার অবস্থা, যখন যুলকারনাইন প্রাচীরটি নির্মাণ করেছিলেন। কাজেই এতে কোন বৈপরীত্য নেই। তাছাড়া আরোও বলা যায় যে, কোরআনে ছিদ্র বলে এপার-ওপার ছিদ্র বোঝানো হয়েছে। হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, তাদের এ ছিদ্র এপার-ওপার হবে। (বেদায়া, ২য় খণ্ড, ১১২ পৃঃ)

হাফেয ইবনে হাজার 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে এই হাদীসটি আবদ ইবনে-হুমায়দ ও ইবনে-হাব্বানের বরাত দিয়েও উদ্ধৃত করে বলেছেন ঃ তারা সবাই হযরত কাতাদাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং কোন কোন হাদীসে সনদের ব্যক্তিবর্গ সহীহ্ বোখারীর ব্যক্তিবর্গ। তিনি হাদীসটি যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ প্রকাশ করেননি। তিনি ইবনে আরাবীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, এ হাদীসে তিনটি মু'জিযা রয়েছে। এক. আল্লাহ্ তা'আলা তাদের চিন্তাধারা এদিকে নিবিষ্ট হতে দেননি যে, প্রাচীর খননের কাজ অবিরাম দিবারাত্র অব্যাহত রাখবে। নতুবা দিন ও রাত্রির কর্মসূচী আলাদা আলাদা নির্ধারণ করে কাজ সমাপ্ত করা এত বড় জাতির পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না। দুই. আল্লাহ্ তা'আলা প্রাচীরের উপরে উঠার পরিকল্পনা থেকেও তাদের চিন্তাধারাকে সরিয়ে রেখেছেন। অথচ ওয়াহ্ব ইবনে-মুনাব্বেহ্র রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তারা কৃষিশিল্পে পারদর্শী ছিল। সব রকম যন্ত্রপাতি তাদের কাছে ছিল। তাদের ভূখণ্ডে বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষও ছিল। কাজেই প্রাচীরের উপরে আরোহণ করার উপায় সৃষ্টি করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল না। তিন. প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের মনে 'ইনশাআল্লাহ্' বলার কথা জাগ্রত হল না। তাদের বের হওয়ার নির্ধারিত সময় আসলেই কেবল তাদের মুখ দিয়ে এ বাক্য উচ্চারিত হবে।

ইবনে -আরাবী বলেন ঃ এ হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, ইয়াজুজ-মাজুজের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও ইচ্ছায় বিশ্বাস রাখে। এটাও সম্ভব যে, বিশ্বাস ছাড়াই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মুখ দিয়ে এ বাক্য উচ্চারিত করিয়ে দিবেন এবং এর বরকতে তারা তাদের উদ্দেশ্যে সিদ্ধিলাভ করবে। ---(আসারাতুস সায়া, সৈয়দ মুহাম্মদ, ১৫৪ পৃঃ) কিন্তু বাহ্যত বোঝা যায় যে, তাদের কাছেও পয়গম্বরদের দাওয়াত পৌঁছেছে। নতুবা কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের জাহান্নামের শাস্তি

না হওয়াই উচিত। কোরআন বলে ঃ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا

---এতে বোঝা যায় যে, তারাও ঈমানের দাওয়াত লাভ করেছে। কিন্তু তারা কুফরকে আঁকড়ে রেখেছে। তাদের কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও ইচ্ছায় বিশ্বাসী হবে। তবে রিসালত ও আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত শুধু এতটুকু বিশ্বাসই ঈমানের জন্য যথেষ্ট নয়। মোটকথা ইনশাআল্লাহ্ কলেমা বলার পরও কুফরের অস্তিত্ব থাকতে পারে।

হাদীসসমূহের বর্ণনা থেকে অর্জিত ফলাফল ঃ উল্লিখিত হাদীসসমূহে ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে নিম্নলিখিত বিষয়াদি প্রমাণিত হয়েছে ঃ

১. ইয়াজুজ-মাজুজ সাধারণ মানুষের মতই মানুষ এবং নূহ (আ)-র সন্তান-সন্ততি। অধিকাংশ হাদীসবিদ ও ইতিহাসবিদগণ তাদেরকে ইয়াফেস ইবনে নূহের বংশধর সাব্যস্ত করেছেন। একথাও বলা বাহুল্য যে, ইয়াফেসের বংশধর নূহ (আ)-র আমল থেকে যুলকারনাইনের আমল পর্যন্ত দূরদূরান্তরে বিভিন্ন গোত্রে ও বিভিন্ন জনপদে ছড়িয়ে পড়েছিল। যেসব সম্প্রদায়ের নাম ইয়াজুজ-মাজুজ, জরুরী নয় যে, তারা সবাই যুলকারনাইনের প্রাচীরের ওপারে আবদ্ধ হয়ে গেছে। তাদের কিছু গোত্র ও সম্প্রদায় প্রাচীরের এপারেও থাকতে পারে। কিন্তু ইয়াজুজ-মাজুজ শুধু তাদেরই নাম, যারা বর্বর অসভ্য ও রক্তপিপাসু, জালিম। মোগল তুর্কী অথবা মঙ্গোলীয় জাতি যারা সভ্যতা লাভ করেছে, ওরাও তাদের অন্তর্ভুক্ত হলেও তারা নামের বাইরে।

২. ইয়াজুজ-মাজুজের সংখ্যা বিশ্বের সমগ্র জনসংখ্যার চাইতে অনেক গুণ বেশী, কমপক্ষে এক ও দশের ব্যবধান।---(২ নং হাদীস)

৩. ইয়াজুজ-মাজুজের যেসব সম্প্রদায় ও গোত্র যুলকারনাইনের প্রাচীরের কারণে ওপারে আবদ্ধ হয়ে গেছে, তাঁরা কিয়ামতের সন্নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত এভাবেই আবদ্ধ থাকবে। তাদের বের হওয়ার সময় মেহদী (আ)-র আবির্ভাব, অতঃপর দাজ্জালের আগমনের পরে হবে, যখন ঈসা (আ) অবতরণ করে দাজ্জালের নিধন কার্য সমাপ্ত করবেন।---(১নং হাদীস)

৪. ইয়াজুজ-মাজুজের মুক্ত হওয়ার সময় যুলকারনাইনের প্রাচীর বিধ্বস্ত হয়ে সমতলভূমির সমান হয়ে যাবে।---(কোরআন) তখন ইয়াজুজ-মাজুজের অগণিত লোক একযোগে পর্বতের উপর থেকে অবতরণের সময় দ্রুতগতির কারণে মনে হবে যেন তারা পিছলে পিছলে নিচে গড়িয়ে পড়ছে। এই অপরিসীম বর্বর মানবগোষ্ঠীর সাধারণ জনবসতি ও সমগ্র পৃথিবীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাদের হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজের মুকাবিলা করার সাধ্য কারও থাকবে না। আল্লাহ্র রসূল হযরত ঈসা (আ) ও আল্লাহ্র আদেশে মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে তূর পর্বতে আশ্রয় নেবেন এবং যেখানে যেখানে কেল্লা ও সংরক্ষিত স্থান থাকবে, সেখানেই আত্মগোপন করে প্রাণ রক্ষা করবেন। পানাহারের রসদ-সামগ্রী নিঃশেষ হওয়ার পর জীবনধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের

মূল্য আকাশচুম্বী হয়ে যাবে। এই বর্বর জাতি অবশিষ্ট জনবসতিকে খতম করে দেবে এবং নদ-নদীর পানি নিঃশেষে পান করে ফেলবে।—(১ নং হাদীস)

৫. হযরত ঈসা (আ) ও তাঁর সঙ্গীদেরই দোয়ায় এই পঙ্গপালসদৃশ অগণিত লোক নিপাত হয়ে যাবে। তাদের মৃতদেহ সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে এবং দুর্গন্ধের কারণে পৃথিবীতে বাস করা দুরূহ হয়ে পড়বে।—(১নং হাদীস)

৬. অতঃপর ঈসা (আ) ও তাঁর সঙ্গীদেরই দোয়ায় তাদের মৃতদেহ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত অথবা অদৃশ্য করে দেয়া হবে এবং বিশ্বব্যাপী বৃষ্টির মাধ্যমে সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে ধুয়ে পাক-সাফ করা হবে।—(১ নং হাদীস)

৭. এরপর প্রায় চল্লিশ বছর পৃথিবীতে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। ভূপৃষ্ঠ তার বরকতসমূহ উদ্‌গিরণ করে দিবে। কেউ দরিদ্র থাকবে না এবং কেউ কাউকে বিব্রত করবে না। সর্বত্রই শান্তি ও সুখ বিরাজ করবে।—(৩নং হাদীস)

৮. শান্তি ও শৃঙ্খলার সময় কা'বা গৃহের হজ্জ ও ওমরাহ্ অব্যাহত থাকবে।—(৪ নং হাদীস)

হাদীসে প্রমাণিত রয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ)-র ওফাত হবে এবং তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রওযা মোবারকে সমাহিত হবেন। অর্থাৎ তিনি হজ্জ ও ওমরার উদ্দেশ্যেই হেজায সফর করার সময় ওফাত পাবেন।—(মুসলিম)

৯. রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জীবনের শেষভাগে স্বপ্ন-ওহীর মাধ্যমে তাঁকে দেখানো হয় যে, যুলকারনাইনের প্রাচীরে একটি ছিদ্র হয়ে গেছে। তিনি একে আরবদের ধ্বংস ও অবনতির লক্ষণ বলে সাব্যস্ত করেন। প্রাচীরে ছিদ্র হয়ে যাওয়াকে কেউ কেউ প্রকৃত অর্থেও নিয়েছেন এবং কেউ কেউ রূপক অর্থে বুঝেছেন যে, প্রাচীরটি এখন দুর্বল হয়ে পড়েছে, ইয়াজুজ-মাজুজের বের হওয়ার সময় নিকটে এসে গেছে এবং এর আলামত আরব জাতির অধঃপতনরূপে প্রকাশিত হবে। والله اعلم

১০. হযরত ঈসা (আ) অবতরণের পর পৃথিবীতে চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন —(৩ নং হাদীস) তাঁর পূর্বে হযরত মাহ্‌দী (আ)-এর অবস্থানকাল চল্লিশ বছর হবে। তন্মধ্যে কিছুকাল হবে উভয়ের সহযোগিতায়। সৈয়দ শরীফ বরযঞ্জী "আসারাতুসসায়াহ্ গ্রন্থের ১৪৫ পৃষ্ঠায় লেখেন ঃ দাজ্জালের হত্যা ও শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ঈসা (আ) চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন এবং তাঁর মোট অবস্থানকাল হবে পঁয়তাল্লিশ বছর। ১১২ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ঃ হযরত মাহ্‌দী (আ) হযরত ঈসা (আ)-র ত্রিশের উপর কয়েক বছর আগে আবির্ভূত হবেন এবং তাঁর মোট অবস্থানকাল হবে চল্লিশ বছর। এভাবে পাঁচ অথবা সাত বছর পর্যন্ত উভয়ে একত্রে বসবাস করবেন। এই উভয় কালের বৈশিষ্ট্য হবে এই যে, সমগ্র ভূপৃষ্ঠে ন্যায় ও সুবিচারের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। ভূপৃষ্ঠ তার সব বরকত ও গুপ্তধন উদ্‌গিরণ করে দেবে। কেউ ফকির-মিসকীন থাকবে না। পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও প্রতিহিংসার লেশমাত্র থাকবে না। অবশ্য মেহদী (আ)-র

শেষ আমলে দাজ্জাল এসে মক্কা-মদীনা বায়তুল-মোকাদ্দাস ও তূর পর্বত ব্যতীত সর্বত্র দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ফিতনা ছড়িয়ে দেবে। এই ফিতনাটি হবে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ফিতনা। দাজ্জালের অবস্থান ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা মাত্র চল্লিশ দিন স্থায়ী হবে। তন্মধ্যে প্রথম দিন এক বছরের দ্বিতীয় দিন এক মাসের এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। আর অবশিষ্ট দিনগুলো হবে সাধারণ দিনেরই মতো। এখানে প্রকৃতপক্ষে দিনগুলো এমন দীর্ঘ করে দেয়া যেতে পারে। কেননা শেষ যুগে প্রায় সব ঘটনাই অভ্যাসবিরুদ্ধ ঘটবে। এমনও সম্ভব যে, দিন তো প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিকই থাকবে কিন্তু হাদীস থেকে জানা যায় যে, দাজ্জাল হবে অসাধারণ যাদুকর। কাজেই তার যাদুর প্রভাবে দিবারাত্রির পরিবর্তন সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে ধরা না-ও পড়তে পারে। তারা একে একই দিন দেখবে ও মনে করবে। হাদীসে সে দিনে সাধারণ দিন অনুযায়ী অনুমান করে নামায পড়ার আদেশ বর্ণিত রয়েছে। এ থেকেও এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায় যে, প্রকৃতপক্ষে দিবারাত্র পরিবর্তিত হতে থাকবে, কিন্তু মানুষ তা অনুভব করবে না। তাই এই এক বছরের দিনে তিন শ' ষাট দিনের নামায আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নতুবা দিনটি প্রকৃতপক্ষে একদিন হলে শরীয়তের নীতি অনুযায়ী তাতে একদিনের নামাযই ফরয হত। মোটকথা দাজ্জালের মোট অবস্থানকাল এমনি ধরনের চল্লিশ দিন হবে।

এরপর হযরত ঈসা (আ) অবতরণ করে দাজ্জালকে হত্যা করার মাধ্যমে তার ফিতনারও অবসান ঘটাবেন। কিন্তু এর সাথে সাথেই ইয়াজুজ-মাজুজ বের হবে। তারা ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র হত্যা ও লুটতরাজ করবে। তাদের অবস্থানকালও কয়েকদিন মাত্র হবে। এরপর হযরত ঈসা (আ)-র দোয়ায় তারা সবাই একযোগে মারা যাবে। মোটকথা, হযরত মেহদীর আমলের শেষ ভাগে এবং ঈসা (আ)-র আমলের শুরুভাগে দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজের দু'টি ফিতনা সংঘটিত হবে। এগুলো সারা বিশ্বের মানুষকে তছনছ করে দেবে। এই কয়েক দিনের পূর্বে এবং পরে সমগ্র বিশ্বে ন্যায় ও সুবিচার, শান্তি ও বরকত এবং ফল ও শস্যের অভূতপূর্ব আধিক্য হবে। হযরত ঈসা (আ)-র আমলে ইসলাম ব্যতীত কোন কলেমা ও ধর্মের অস্তিত্ব থাকবে না, কোন দীন-দুঃখী থাকবে না। হিংস্র এবং বিষাক্ত জীবজন্তুও একে অপরকে কষ্ট দিবে না।

ইয়াজুজ-মাজুজ ও যুলকারনাইনের প্রাচীর সম্পর্কিত এ সব তথ্য কোরআন ও হাদীস উম্মতকে অবহিত করেছে। এগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখা জরুরী এবং বিরোধিতা করা না-জায়েয। যুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত? ইয়াজুজ-মাজুজ কোন জাতি? তারা কোথায় বসবাস করে? এ সব ভৌগোলিক আলোচনার উপর ইসলামের কোন আকীদা-বিশ্বাস এবং কোরআনের কোন আয়াতের মর্ম ও ব্যাখ্যা নির্ভরশীল নয়। এতদসত্ত্বেও বিরোধী পক্ষের আবোল-তাবোল বকাবকির জওয়াব এবং অতিরিক্ত জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে আলিমরা এগুলো সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। এ আলোচনার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হচ্ছে ঃ

কুরতুবী স্বয়ং তফসীর গ্রন্থে সুদ্দীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াজুজ-মাজুজের বাইশটি গোত্রের মধ্য থেকে একুশটি গোত্রকে যুলকারনাইনের প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ

করে দেয়া হয়েছে। একটি গোত্র প্রাচীরের এপারে রয়ে গেছে। আর সে গোত্রটি হল তুর্ক। এরপর কুরতুবী বলেনঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) তুর্কদের সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন, সেগুলো ইয়াজুজ-মাজুজের সাথে খাপ খায়। শেষ যমানায় তাদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধের কথা সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে। অতঃপর কুরতুবী বলেনঃ বর্তমান সময় তুর্ক জাতির বিপুলসংখ্যক লোক মুসলমানদের মুকাবিলা করার জন্য অগ্রসরমান। তাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। তিনিই মুসলমানদেরকে তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচাতে পারেন। মনে হয় যেন তারাই ইয়াজুজ-মাজুজের অথবা কমপক্ষে তাদের অগ্রসেনাদল।--(কুরতুবী, একাদশ খণ্ড, ৫৮ পৃঃ কুরতুবী সময়কাল ষষ্ঠ হিজরী। তখন তাতারীদের ফিতনা প্রকাশ পায় এবং তারা ইসলামী খিলাফতকে তছনছ করে দেয়। ইসলামী ইতিহাসে তাদের এই ফিতনা সুবিদিত। তাতারীরা যে মোগল তুর্কদের বংশধর; তাও প্রসিদ্ধ।) কিন্তু কুরতুবী তাদেরকে ইয়াজুজ-মাজুজের সমতুল্য এবং অগ্রসেনাদল সাব্যস্ত করেছেন। তাদের ফিতনাকে ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব বলেননি, যা কিয়ামতের অন্যতম আলামত। কেননা, মুসলিমের হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, ঈসা (আ)-র অবতরণের পর তাঁর আমলে ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হবে।

এ কারণেই আল্লামা আলুসী তফসীর রূহুল মা'আনীতে যারা তাতারীদেরকে ইয়াজুজ-মাজুজ সাব্যস্ত করে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করে বলেছেনঃ এরূপ ধারণা করা প্রকাশ্য রকমের পথভ্রষ্টতা এবং হাদীসের বর্ণনার সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ। তবে তিনিও বলেছেন যে, নিঃসন্দেহে তাতারীদের ফিতনা ইয়াজুজ-মাজুজের ফিতনার সমতুল্য।----(১৬শ খণ্ড, ৪৪ পৃঃ) বর্তমান যুগে কিছু সংখ্যক ইতিহাসবিদ বর্তমান রাশিয়া অথবা চীন অথবা উভয়কেই ইয়াজুজ-মাজুজ সাব্যস্ত করেন। তাদের উদ্দেশ্য যদি কুরতুবী ও আলুসীর মতই হয় যে, তাদের ফিতনা ইয়াজুজ-মাজুজের ফিতনার সমতুল্য, তবে তা ভ্রান্ত হবে না। কিন্তু তাঁরা যদি তাদেরকেই কিয়ামতের আলামতরূপে কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হিসেবে সাব্যস্ত করেন, যার সময় ঈসা (আ)-র অবতরণের পরে বলা হয়েছে, তবে তা নিশ্চিতই ভ্রান্তি, পথভ্রষ্টতা ও হাদীসের বর্ণনার বিরুদ্ধাচরণ হবে।

খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকায় সপ্ত ভূখণ্ডের মধ্য থেকে ষষ্ঠ ভূখণ্ডের আলোচনায় ইয়াজুজ-মাজুজ, যুলকারনাইনের প্রাচীর এবং তাদের অবস্থানস্থল সম্পর্কে ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণজনিত নিম্নরূপ বক্তব্য রেখেছেনঃ

> সপ্তম ভূখণ্ডের নবম অংশে পশ্চিমদিকে তুর্কীদের কাজাক ও চর্কস নামে অভিহিত গোত্রসমূহ বসবাস করে এবং পূর্বদিকে ইয়াজুজ-মাজুজের বসতি অবস্থিত তাদের উভয়ের মধ্যস্থলে ককেশাস পর্বতমালা অবস্থিত। পূর্বে বলা হয়েছে যে, এই পর্বতমালা চতুর্থ ভূখণ্ডের পূর্বদিকে অবস্থিত ভূমধ্যসাগর থেকে শুরু হয়ে এই ভূখণ্ডেরই শেষ উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এরপর ভূমধ্যসাগর থেকে পৃথক হয়ে উত্তর পশ্চিম দিকে বিস্তৃত হয়ে পঞ্চম ভূখণ্ডের নবম অংশে প্রবেশ লাভ করেছে। এখান থেকে তা আবার প্রথম দিকে মোড় নিয়েছে এবং সপ্তম ভূখণ্ডের

নবম অংশে প্রবেশ করেছে। এখানে পৌঁছে তা দক্ষিণ থেকে উত্তর-পশ্চিম হয়ে চলে গেছে। এই পর্বতমালা মাঝখানে সিকান্দরী প্রাচীর অবস্থিত, আমরা এইমাত্র যার উল্লেখ করেছি এবং কোরআনও যার সংবাদ দিয়েছে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে খরদাযবাহ্ স্বীয় ভূগোল গ্রন্থে আব্বাসী খলীফা ওয়াসিক বিল্লাহ্‌র একটি স্বপ্ন বর্ণনা করেছেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, প্রাচীর খুলে গেছে। এতে তিনি অস্থির হয়ে উঠে বসেন এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য তাঁর মুখপাত্র সাল্লামকে প্রেরণ করেন। সে ফিরে এসে এই প্রাচীরের অবস্থা বর্ণনা করে।---(ইবনে খলদুনের 'মুকাদ্দামা' ৭৯ পৃঃ)

আব্বাসী খলীফা ওয়াসিক বিল্লাহ্ কর্তৃক যুলকারনাইনের প্রাচীর পর্যবেক্ষণের জন্যে একটি দল প্রেরণ করা এবং তাদের পর্যবেক্ষণ করে ফিরে আসার কথা ইবনে কাসীরও 'আল বেদায়া ওয়ান্নেহায়হ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাতে আরও বর্ণিত রয়েছে যে, এই প্রাচীর লৌহনির্মিত। এতে বড় বড় তালাবদ্ধ দরজাও আছে এবং এটি উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। তফসীর কবীর ও তাবারী এই ঘটনা বর্ণনা করে লিখেছেন ঃ যে ব্যক্তি এই প্রাচীর পরিদর্শন করে ফিরে আসতে চায়, গাইড তাকে এমন লতাপাতাবিহীন প্রান্তরে পৌঁছে দেয়, যা সমরখন্দের বিপরীত দিকে অবস্থিত। ---(তফসীর কবীর, ৫ম খণ্ড ৫১ পৃঃ)

শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশমীরী (রহ) 'আকীদাতুল ইসলাম ফী হায়াতে ঈসা (আ) গ্রন্থে ইয়াজুজ-মাজুজ ও যুলকারনাইনের প্রাচীরের অবস্থা প্রসঙ্গক্রমে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু যতটুকু বর্ণনা করেছেন তা অনুসন্ধান ও রেওয়ায়েতের মাপকাঠিতে উৎকৃষ্ট পর্যায়ের। তিনি বলেন ঃ দুষ্কৃতকারী ও বর্বর মানুষদের লুণ্ঠন থেকে আত্মরক্ষার জন্য পৃথিবীতে এক নয়---বহু জায়গায় প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলো বিভিন্ন বাদশাহ্‌গণ বিভিন্ন স্থানে নির্মাণ করেছেন। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ ও সর্বপ্রসিদ্ধ হচ্ছে চীনের প্রাচীর। এর দৈর্ঘ্য আবু হাইয়ান আন্দালুসী (ইরানের শাহী দরবারের ঐতিহাসিক) বার শত মাইল বর্ণনা করেছেন। এর প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন চীন সম্রাট 'ফগফুর'। এর নির্মাণের তারিখ আদম (আ)-এর অবতরণের তিন হাজার চার শত ষাট বছর পর বর্ণনা করা হয়। এই চীন প্রাচীরকে মোগলরা 'আনকুদাহ্' এবং তুর্কীরা 'বুরকুরকা' বলে থাকে। তিনি আরও বলেন ঃ এমনি ধরনের আরও কয়েকটি প্রাচীর বিভিন্নস্থানে পরিদৃষ্ট হয়।

মওলানা হিফজুর রহমান সিহওয়ারী (রহ) কাসাসুল কোরআনে বিস্তারিতভাবে শাহ সাহেবের উপরোক্ত বর্ণনার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করেছে। এর সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

ইয়াজুজ-মাজুজের লুণ্ঠন ও ধ্বংসকাণ্ড সাধনের পরিধি বিশাল এলাকাব্যাপী বিস্তৃত ছিল। একদিকে ককেশিয়ার পাদদেশে বসবাসকারীরা তাদের জুলুম ও নির্যাতনের শিকার ছিল এবং অপরদিকে তিব্বত ও চীনের অধিবাসীরাও ছিল সর্বক্ষণ তাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। এই ইয়াজুজ-মাজুজের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিভিন্ন

সময় বিভিন্ন স্থানে একাধিক প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ ও প্রসিদ্ধ প্রাচীর হচ্ছে চীনের প্রাচীর। উপরে এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রাচীর মধ্য এশিয়ার বুখারা ও তিরমিযের নিকটে অবস্থিত। এর অবস্থানস্থলের নাম দরবন্দ! এই প্রাচীরটি খ্যাতনামা মোগল সম্রাট তৈমুরের আমলে বিদ্যমান ছিল। রোম সম্রাটের বিশেষ সভাসদ সীলা বর্জর জর্মেনীও তার গ্রন্থে এর কথা উল্লেখ করেছেন। আন্দালুসের সম্রাট কাস্টাঈলের দূত ক্ল্যাফছুও তার ভ্রমণ কাহিনীতে এর উল্লেখ করেছেন। ১৪০৩ খৃস্টাব্দে যখন তিনি সম্রাটের দূত হিসেবে তৈমুরের দরবারে পৌঁছেন, তখন এ স্থান অতিক্রম করেন। তিনি লিখেন ঃ বাবুল হাদীসের প্রাচীর মুসেলের ঐ পথে অবস্থিত, যা সমরখন্দ ও ভারতের মধ্যস্থলে বিদ্যমান।—(তফসীরে জওয়াহেরুল-কোরআন, তানতাভী, ৯ম খণ্ড, ১৯৮ পৃঃ)

তৃতীয় প্রাচীর রাশিয়ান এলাকা দাগিস্তানে অবস্থিত। এটিও দরবন্দ ও বাবুল আবওয়ার নামে খ্যাত। ইয়াকুত হমভী 'মুজামুল বুলদানে,' ইদরীসী 'জুগরাফিয়া'য় এবং বুস্তানী 'দায়েরাতুল মা'আরিফে' এর অবস্থা বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছেন। এর সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

> দাগিস্তানে দরবন্দ একটি রাশিয়ান শহর। শহরটি কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এটি ৩° উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৪৩° উত্তর অক্ষাংশ এবং ১৫° পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৪৮° পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত। একে দরবন্দে নওশেরওয়াঁ নামেও অভিহিত করা হয়। তবে বাবুল-আবওয়াব নামে তা বিশেষ প্রসিদ্ধ।

চতুর্থ প্রাচীর বাবুল আবওয়াব থেকে পশ্চিম দিকে ককেশিয়ার সুউচ্চ মালভূমিতে অবস্থিত। সেখানে দুই পাহাড়ের মধ্যস্থলে দারিয়াল নামে একটি প্রসিদ্ধ গিরিপথ রয়েছে। এই চতুর্থ প্রাচীরটি এখানে কাফকায অথবা জাবালে-কোফা অথবা কাফ পর্বতমালার প্রাচীর নামে খ্যাত। বুস্তানী এ সম্পর্কে লেখেন ঃ

> এবং এরই (অর্থাৎ বাবুল-আবওয়াব প্রাচীরের) নিকটে আরও একটি প্রাচীর রয়েছে, যা পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেছে। সম্ভবত পারস্যবাসীরা উত্তরাঞ্চলীয় বর্বরদের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য এটি নির্মাণ করেছে। এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে সঠিক ও বিশুদ্ধ কোন বর্ণনা জানা যায়নি। প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে কেউ কেউ একে সিকান্দরের প্রতি, কেউ কেউ পারস্য সম্রাট নওশেরওয়াঁর প্রতি এর সম্বন্ধ নির্দেশ করেছে। ইয়াকুত বলেন ঃ গলিত তামা দ্বারা এটি নির্মিত হয়েছে।
> —(দায়েরাতুল-মা'আরিফ ৭ম খণ্ড, ৬৫ পৃঃ)

এসব প্রাচীর সবগুলোই উত্তরদিকে অবস্থিত এবং প্রায় একই উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছে। তাই এগুলোর মধ্যে যুলকারনাইনের প্রাচীর কোনটি, তা নির্ণয় করা কঠিন। শেষোক্ত দু'টি প্রাচীরের ব্যাপারেই অধিক মতভিন্নতা দেখা দিয়েছে। কেননা, উভয়স্থানের নাম দরবন্দ এবং উভয়স্থলে প্রাচীরও বিদ্যমান রয়েছে। উল্লিখিত চারটি প্রাচীরের মধ্যে সবচাইতে বড় ও সবচাইতে প্রাচীন চীনের প্রাচীর যুলকারনাইনের প্রাচীর নয়, এ

বিষয়ে সবাই একমত। এটি উত্তরদিকে নয়---দূরপ্রাচ্যে অবস্থিত। কোরআন পাকের ইঙ্গিত দ্বারা বোঝা যায় যে, যুলকারনাইনের প্রাচীরটি উত্তর ভূখণ্ডে অবস্থিত।

এখন উত্তর ভূখণ্ডে অবস্থিত তিনটি প্রাচীর সম্পর্কিত পর্যালোচনা বাকী রয়ে গেল। তন্মধ্যে মাসউদী, ইসতাখরী, হমভী প্রমুখ ইতিহাসবিদ সাধারণভাবে সে প্রাচীরকে যুলকারনাইনের প্রাচীর বলেন, যা দাগিস্তান অথবা ককেশিয়ার এলাকা বাবুল-আবওয়াবের দরবন্দ নামক স্থানে কাস্পিয়ানের তীরে অবস্থিত। বুখারা ও তিরমিযির দরবন্দে অবস্থিত প্রাচীরকে যারা যুলকারনাইনের প্রাচীর বলেছেন, তারা সম্ভবত দরবন্দ নাম দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন। এখন যুলকারনাইনের প্রাচীরের অবস্থানকাল প্রায় নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ দু'টি প্রাচীরের মধ্যে ব্যাপার সীমিত হয়ে গেছে। এক. দাগিস্থান ককেশিয়ার এলাকা বাবুল-আবওয়াবের দরবন্দের প্রাচীর এবং দুই. আরও উচ্চে কাফকায অথবা কাফ অথবা ককেশাস পর্বতমালায় অবস্থিত প্রাচীরঃ উভয় স্থানে প্রাচীরের অস্তিত্ব ইতিহাসবিদদের কাছে প্রমাণিত রয়েছে।

হযরত মওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (রহ) 'আকীদাতুল ইসলাম' গ্রন্থে উভয় প্রাচীরের মধ্য থেকে ককেশাস পর্বতমালায় অবস্থিত প্রাচীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, এটিই যুলকারনাইন নির্মিত প্রাচীর।

যুলকারনাইনের প্রাচীর এখনও বিদ্যমান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, না ভেঙ্গে গেছে ঃ ইউরোপীয় ইতিহাস ও ভূগোল বিশেষজ্ঞরা আজকাল উপরোক্ত প্রাচীর-সমূহের কোনটির অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। তারা এ কথাও স্বীকার করেন না যে, ইয়াজুজ-মাজুজের পথ অদ্যাবধি বন্ধ রয়েছে। এরই ভিত্তিতে কোন কোন মুসলমান ইতিহাসবিদও এ কথা বলতে লিখতে শুরু করেছেন যে, কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত ইয়াজুজ-মাজুজ বহু পূর্বেই বের হয়ে গেছে। কেউ কেউ হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীতে ঝটিকার বেগে উত্থিত তাতারীদেরকেই এর নিদর্শন সাব্যস্ত করেছেন। কেউ কেউ বর্তমান যুগের পরাশক্তি রাশিয়া চীন, ও ইউরোপীয়দেরকে ইয়াজুজ-মাজুজ বলে দিয়ে ব্যাপারটি সাঙ্গ করে দিয়েছেন। কিন্তু উপরে রূহুল মা'আনীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সহীহ্ হাদীসসমূহ অস্বীকার করা ছাড়া কেউ একথা বলতে পারে না। কোরআন পাক ইয়াজুজ-মাজুজের অভ্যুত্থানকে কিয়ামতের আলামত হিসেবে বর্ণনা করেছে। নাওয়াম ইবনে সামআন প্রমুখ বর্ণিত সহীহ মুসলিমের হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, ইয়াজুজ-মাজুজের ঘটনাটি ঘটবে দাজ্জালের আবির্ভাব এবং ঈসা (আ)-র অবতরণ ও দাজ্জাল হত্যার পরে। দাজ্জালের আবির্ভাব এবং ঈসা (আ)-র অবতরণ যে আজও পর্যন্ত হয়নি, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

তবে যুলকারনাইনের প্রাচীর বর্তমানে ভেঙ্গে গেছে এবং ইয়াজুজ-মাজুজের কোন কোন গোত্র এপারে চলে এসেছে---একথা বলাও কোরআন ও হাদীসের কোন সুস্পষ্ট বর্ণনার পরিপন্থী নয়---যদি মেনে নেয়া হয় যে, তাদের সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত-

কারী সর্বশেষ ও সর্বধ্বংসী হামলা এখনও হয়নি; বরং তা উপরে বর্ণিত দাজ্জালের আবির্ভাব এবং ঈসা (আ)-র অবতরণের পরে হবে।

এ ব্যাপারে হযরত উস্তাদ আল্লামা কাশমীরী (রহ)-এর সুচিন্তিত বক্তব্য এই ঃ ইউরোপীয়দের এ বক্তব্যের কোন গুরুত্ব নেই যে, তারা সমগ্র ভূপৃষ্ঠ তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে যে, কোথাও এই প্রচীরের অস্তিত্ব নেই। কেননা, স্বয়ং তাদেরই এ ধরনের বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে যে, পর্যটন ও অন্বেষণের উচ্চতম শিখরে পৌঁছা সত্ত্বেও অনেক অরণ্য, সমুদ্র ও দ্বীপ সম্পর্কে তারা অদ্যাবধি জ্ঞানলাভ করতে পারেনি। এ ছাড়া এরূপ সম্ভাবনাও দূরবর্তী নয় যে, কথিত প্রাচীরটি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পাহাড়সমূহের পতন ও পারস্পরিক সংযুক্তির কারণে তা একটি পাহাড়ের আকার ধারণ করে ফেলেছে। কিয়ামতের পূর্বে প্রাচীরটি ভেঙ্গে যাবে অথবা দূরবর্তী পথ ধরে ইয়াজুজ-মাজুজের কিছু গোত্র এপারে এসে যাবে---কোরআন ও হাদীসের কোন অকাট্য প্রমাণ এ বিষয়েরও পরিপন্থী নয়। যুলকারনাইনের প্রাচীর কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবে---এর পক্ষে বড় প্রমাণ হচ্ছে কোরআনে পাকের আয়াত فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ — অর্থাৎ যুলকারনাইনের এই উক্তি যে, যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি এসে যাবে (অর্থাৎ ইয়াজুজ-মাজুজের বেরিয়ে আসার সময় হবে,) তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই লৌহ প্রাচীর চূর্ণবিচূর্ণ করে ভূমিসাৎ করে দেবেন। এই আয়াতে وَعْدُ رَبِّي (আমার পালনকর্তার ওয়াদা)-এর অর্থ কিয়ামত নেয়া হয়েছে। অথচ কোরআনের ভাষ্য-এই অর্থ অকাট্য নয়; বরং এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, যুলকারনাইন ইয়াজুজ-মাজুজের পথ রুদ্ধ করার যে ব্যবস্থা করেছে, তা সদাসবদা যথাযথ থাকা জরুরী নয়। যখন আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াজুজ-মাজুজের পথ খুলে দেওয়ার ইচ্ছা করবেন, তখন এই প্রাচীর বিধ্বস্ত ও ভূমিসাৎ হয়ে যাবে। এটা কিয়ামতের একান্ত নিকটবর্তী সময়ে হওয়াই জরুরী নয়। সে মতে সব তফসীরবিদই وَعْدُ رَبِّي--এর অর্থে উভয় সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন। তফসীর বাহরে-মুহীতে বলা হয়েছে ঃ

والوعد يحتمل ان يراد به يوم القيامة وان يراد به وقت خروج ياجوج وماجوج-

এটা এভাবেও হতে পারে যে, প্রাচীর বিধ্বস্ত হয়ে রাস্তা এখনই খুলে গেছে এবং ইয়াজুজ-মাজুজের আক্রমণের সূচনা হয়ে গেছে। ষষ্ঠ হিজরীর তাতারী ফিতনাকে এর সূচনা সাব্যস্ত করা হোক কিংবা ইউরোপ, রাশিয়া ও চীনের আধিপত্যকে সাব্যস্ত করা হোক। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, এসব সভ্য জাতির আবির্ভাব ও এদের সৃষ্ট ফিতনাকে কোরআন হাদীসে বর্ণিত ফিতনা আখ্যা দেয়া যায় না। কারণ, তাদের আবির্ভাব আইন

ও কানুনের পন্থায় হচ্ছে। কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত সেই ফিতনা এমন অকৃত্রিম হত্যাযজ্ঞ, লুটতরাজ রক্তপাতের মাধ্যমে হবে, যা পৃথিবীর গোটা জনমণ্ডলীকেই ধ্বংস ও বরবাদ করে দেবে। বরং এর সারমর্ম আবার এই দাঁড়ায় যে, দুষ্কৃতকারী ইয়াজুজ-মাজুজেরই কিছু গোত্র এপারে এসে সভ্য হয়ে গেছে। তারাই ইসলামী দেশসমুহের জন্য নিঃসন্দেহে বিরাট ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ইয়াজুজ-মাজুজের সেসব বর্বর গোত্র হত্যা ও রক্তপাত ছাড়া কিছুই জানে না, তারা এখন পর্যন্ত আল্লাহ্‌র বাণীর তফসীর অনুযায়ী এপারে আসেনি। সংখ্যার দিক দিয়ে তারাই হবে বেশি। তাদের আবির্ভাব কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে হবে।

দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে তিরমিযী ও মসনদ আহমদের একটি হাদীস। তাতে উল্লিখিত রয়েছে যে, ইয়াজুজ-মাজুজ প্রত্যহই প্রাচীরটি খনন করে। প্রথমত এই হাদীসটি ইবনে কাসীরের মতে معلول –দ্বিতীয়ত এতেও এ বিষয়ের বর্ণনা নেই যে, ইয়াজুজ-মাজুজ যে দিন 'ইনশাআল্লাহ্‌' বলার বরকতে প্রাচীরটি অতিক্রম করবে, সেদিনটি কিয়ামতের কাছাকাছিই হবে। এই হাদীসে এ বিষয়েরও কোন প্রমাণ নেই যে, ইয়াজুজ-মাজুজের গোটা জাতি এই প্রাচীরের পাশ্চাত্যে আবদ্ধ থাকবে। কাজেই তাদের কিছু দল অথবা গোত্র হয়তো দূরদূরান্তের পথ অতিক্রম করে এপারে এসে গেছে। আজকালকার শক্তিশালী সামুদ্রিক জাহাজের মাধ্যমে এরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। কোন কোন ইতিহাসবিদ এ কথাও লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ইয়াজুজ-মাজুজ দীর্ঘ সামুদ্রিক সফরের মাধ্যমে এপারে আসার পথ পেয়ে গেছে। উপরোক্ত হাদীস এর পরিপন্থী নয়।

মোট কথা; কোরআন ও হাদীসে এরূপ কোন প্রকাশ্য ও অকাট্য প্রমাণ নেই যে, যুলকারনাইনের প্রাচীর কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবে অথবা কিয়ামতের পূর্বে এপারের মানুষের উপর তাদের প্রারম্ভিক ও মামুলী আক্রমণ হতে পারবে না। তবে তাদের চূড়ান্ত, ভয়াবহ ও সর্বনাশা আক্রমণ কিয়ামতের পূর্বে সেই সময়েই হবে, যে সময়ের কথা ইতিপূর্বে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। সারকথা এই যে, কোরআন ও হাদীসের বর্ণনার ভিত্তিতে ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর ভেঙ্গে রাস্তা খুলে গেছে বলে যেমন অকাট্য ফয়সালা করা যায় না; তেমনি এ কথাও বলা যায় না যে, প্রাচীরটি কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকা জরুরী। উভয়দিকেরই সম্ভাবনা রয়েছে। والله اعلم بحقيقة الحال

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِي الصُّوْرِ
فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾ وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا ﴿١٠٠﴾ الَّذِيْنَ
كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾ ع

(৯৯) আমি সেদিন তাদেরকে দলে দলে তরঙ্গের আকারে ছেড়ে দেব এবং শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। অতঃপর আমি তদের সবাইকে একত্রিত করে আনব। (১০০) সেদিন আমি কাফিরদের কাছে জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব। (১০১) যাদের চক্ষুসমূহের উপর পর্দা ছিল আমার স্মরণ থেকে এবং যারা শুনতেও সক্ষম ছিল না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি সেদিন (অর্থাৎ যখন প্রাচীর বিধ্বস্ত হওয়ার প্রতিশ্রুতির দিন আসবে এবং ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হবে, তখন আমি) তাদের এমন অবস্থা করে ছাড়ব যে, একদল অন্য দলের ভেতর ঢুকে পড়বে। (কেননা তারা অগণিত সংখ্যায় একযোগে বের হয়ে পড়বে এবং সবাই একে অপরকে ডিঙ্গিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে।) এবং (এটা কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হবে। এর কিছুদিন পর কিয়ামতের প্রস্তুতি শুরু হবে। প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে। ফলে সমগ্র বিশ্ব নাস্তানাবুদ হয়ে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয়বার) শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে। (ফলে সবাই জীবিত হয়ে যাবে)। অতঃপর আমি সবাইকে একজন একজন করে (হাশরের মাঠে) একত্র করব এবং জাহান্নামকে সেদিন কাফিরদের কাছে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব, যাদের চোখের উপর (দুনিয়াতে) আমার স্মরণ থেকে (অর্থাৎ সত্যধর্মকে দেখার ব্যাপারে) পর্দা পতিত ছিল এবং (তারা যেমন সত্যকে দেখত না, তেমনিভাবে তাকে) শুনতেও পারত না। (অর্থাৎ সত্যকে জানার উপায় দেখা ও শোনা উভয় পথই তারা বন্ধ করে রেখেছিল)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِىْ بَعْضٍ—بَعْضَهُمْ--এর সর্বনাম দ্বারা বাহ্যত ইয়াজুজ-মাজুজকেই বোঝানো হয়েছে। তাদের একদল অপরদলের মধ্যে ঢুকে পড়বে—বাহ্যত এই অবস্থা তখন হবে, যখন তাদের পথ খুলে যাবে এবং তারা পাহাড়ের উচ্চতা থেকে দ্রুতবেগে নিচে অবতরণ করবে। তফসীরবিদগণ অন্যান্য সম্ভাবনাও লিখেছেন।

وَجَمَعْنٰهُمْ—এর সর্বনাম দ্বারা সাধারণ জিন ও মানবজাতিকে বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের মাঠে জিন ও মানবজাতিকে একত্র করা হবে।

أَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا أَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِىْ مِنْ دُوْنِىْٓ أَوْلِيَآءَ ۭ إِنَّآ

أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ

أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ

يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهٖ
فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾ ذٰلِكَ
جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَرُسُلِيْ هُزُوًا ﴿١٠٦﴾ اِنَّ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾

(১০২) কাফিররা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে? আমি কাফেরদের অভ্যর্থনার জন্য জাহান্নামকে প্রস্তুত করে রেখেছি। (১০৩) বলুন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত? (১০৪) তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিবজীবনে বিভ্রান্ত হয়; অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে। (১০৫) তারাই সে লোক, যারা তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী এবং তার সাথে সাক্ষাতের বিষয় অস্বীকার করে। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের জন্য আমি কোন গুরুত্ব স্থির করব না। (১০৬) জাহান্নাম---এটাই তাদের প্রতিফল; কারণ, তারা কাফের হয়েছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রসূলগণকে বিদ্রূপের বিষয়রূপে গ্রহণ করেছে। (১০৭) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের অভ্যর্থনার জন্যে আছে জান্নাতুল ফিরদাউস। (১০৮) সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখানে থেকে স্থান পরিবর্তন করতে চাইবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এরপরও কি কাফিররা মনে করে যে, আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে (অর্থাৎ যারা আমার মালিকানাধীন এবং আমারই আদেশের গোলাম, ইচ্ছাকৃতভাবেই অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদেরকে) অভিভাবক (অর্থাৎ উপাস্য ও অভাব পূরণকারী) রূপে গ্রহণ করবে? (এটা শিরক ও পরিষ্কার কুফর)। আমি কাফিরদের অভ্যর্থনার জন্য জাহান্নামকে প্রস্তুত করে রেখেছি। (ব্যঙ্গচ্ছলে অভ্যর্থনা বলা হয়েছে। তারা যদি তাদের স্বকল্পিত সৎ কর্মের জন্য গর্ববোধ করে এবং এ কারণে নিজেদেরকে মুক্তিপ্রাপ্ত, আযাব থেকে মুক্তি মনে করে, তবে) আপনি (তাদেরকে) বলুন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকদের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত? তারা সেসব লোক, পার্থিবজীবনে যাদের কৃত পরিশ্রম (সৎ কর্ম সম্পাদন যা করেছিল) সবই বিফলে গেছে এবং তারা (মূর্খতাবশত) মনে করেছে যে, তারা ভাল কাজই করছে। (অতঃপর

তাদের উদাহরণ এমনভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে, যাতে তাদের পরিশ্রম বিফল হওয়ার কারণও জানা যায় এবং প্রসঙ্গক্রমে কর্ম বিফল হওয়ার বিষয়াদিরও বিশ্লেষণ হয়ে যায়। অর্থাৎ) তারা সেসব লোক, যারা তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ (অর্থাৎ কিয়ামত) অস্বীকার করে। (তাই) তাদের সব (সৎ) কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে। অতএব, কিয়ামতের দিন আমি তাদের (সৎকর্মের) জন্য সামান্য ওজনও স্থির করব না। (বরং) তাদের প্রতিফল তাই হবে (যা উপরে বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ) জাহান্নাম। কারণ, তারা কুফর করছিল এবং (এই কুফরের একটি শাখা এমনও ছিল যে) আমার নিদর্শনাবলী ও রসূলগণকে উপহাসের বিষয়রূপে গ্রহণ করেছিল। (অতঃপর তাদের বিপরীতে ঈমানদারদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে যে) নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের অভ্যর্থনার জন্য রয়েছে ফিরদাউসের উদ্যান। সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে (তাদেরকে কেউ বের করবে না) এবং সেখান থেকে অন্যত্র যেতে চাইবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

—أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ

তফসীর বাহরে মুহীতে বর্ণিত আছে যে, এ ক্ষেত্রে কিছু বাক্য উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ فيجد بهم نفعا و ينتفعون بذلك الاتخاذ ---উদ্দেশ্য এই যে, এসব কাফির আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করছে ; তারা কি মনে করে যে, এ কাজ তাদেরকে উপকৃত করবে এবং এ দ্বারা তাদের কিছুটা কল্যাণ হবে ? এই জিজ্ঞাসা অস্বীকারবোধক। অর্থাৎ এরূপ মনে করা ভ্রান্তি ও মূর্খতা।

عِبَادِي (আমার দাস) বলে এখানে ফেরেশতা এবং সেসব পয়গম্বরগণকে বোঝানো হয়েছে দুনিয়াতে যাদেরকে উপাস্য ও আল্লাহ্‌র শরীকরূপে স্থির করা হয়েছে ; যেমন হযরত ওযায়ের ও ঈসা (আ)। কিছু সংখ্যক আরব ফেরেশতাদেরও উপাসনা করত, পক্ষান্তরে ইহুদীরা ওযায়ের (আ)-কে এবং খৃস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র শরীকরূপে গ্রহণ করেছে। তাই আয়াতে الَّذِينَ كَفَرُوا বলে কাফেরদের এসব দলকেই বোঝানো হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ এখানে 'আমার বান্দা' অর্থ নিয়েছেন শয়তান। সুতরাং الذين كفروا -এর অর্থ হবে যারা শয়তান ও জিনের উপাসনা করে। কেউ কেউ 'আমার বান্দা' অর্থ ও সৃজিত এবং মালিকানাধীন বস্তু গ্রহণ করে একে ব্যাপকাকার করে দিয়েছেন। ফলে আগুন, মূর্তি, তারকা ইত্যাদি মিথ্যা উপাস্যও

এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এ অর্থের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে! বাহ্‌রে মুহীত প্রভৃতি গ্রন্থে প্রথম তফসীরকেই প্রবল সাব্যস্ত করা হয়েছে।

أَوْلِيَاءَ—এটি وَلِيٌّ-এর বহুবচন। আরবী ভাষায় এ শব্দ অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে এর অর্থ কার্যনির্বাহী, অভাব পূরণকারী, যা সত্য উপাস্যের বিশেষ গুণ। উদ্দেশ্য, তাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করা।

الْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا— এখানে প্রথম দুই আয়াত এমন ব্যক্তি ও দলকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যারা কোন কোন বিষয়কে সৎ মনে করে তাতে পরিশ্রম করে। কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে তাদের সে পরিশ্রম বৃথা এবং সে কর্মও নিষ্ফল। কুরতুবী বলেন, এ অবস্থা দু'টি কারণে সৃষ্টি হয়। এক. ভ্রান্তবিশ্বাস এবং দুই. লোক দেখানো মনোবৃত্তি। অর্থাৎ সব বিশ্বাস ও ঈমান ঠিক নয়, সে যত ভাল কাজই করুক, যত পরিশ্রমই করুক, পরকালে সবই বৃথা ও নিষ্ফল প্রতিপন্ন হবে।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য লোকদেখানো মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ করে সে-ও তার সে কাজের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। এই ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে কোন কোন সাহাবী খারেজী সম্প্রদায়কে এবং কোন কোন তফসীরবিদ মু'তাযিলা, রাওয়াফেয ইত্যাদি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়কে আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু পরবর্তী আয়াতে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এখানে সেসব কাফিরকে বোঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী এবং কিয়ামত ও পরকাল অস্বীকার করে।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ—তাই কুরতুবী, আবূ হাইয়্যান, মাযহারী প্রভৃতি গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এখানে প্রকৃত উদ্দেশ্য হল সেসব কাফির সম্প্রদায়, যারা আল্লাহ্, কিয়ামত ও হিসাব-কিতাব অস্বীকার করে। কিন্তু বাহ্যত তারাও এর ব্যাপক অর্থের সাথে সম্পর্কহীন হতে পারে না, যাদের অপবিশ্বাস তাদের কর্মকে বরবাদ ও পরিশ্রম নিষ্ফল করে দেয়। হযরত আলী ও সা'দ (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে এ ধরনের উক্তি বর্ণিত আছে।—(কুরতুবী)

فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا—অর্থাৎ তাদের আমল বাহ্যত বিরাট বলে দেখা যাবে, কিন্তু হিসাবের দাঁড়ি-পাল্লায় তার কোন ওজন হবে না। কেননা কুফর ও শিরকের কারণে তাদের আমল নিষ্ফল ও গুরুত্বহীন হয়ে যাবে।

বোখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত মতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন জনৈক দীর্ঘদেহী স্থূলকায় ব্যক্তি আসবে, আল্লাহ্‌র কাছে মাছির

ডানার সমপরিমাণও তার ওজন হবে না। অতঃপর তিনি বলেন, যদি এর সমর্থন চাও, তবে কোরআনের এই আয়াত পাঠ কর ঃ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন এমন এমন কাজকর্ম করা হবে, যেগুলো স্থূলতার দিক দিয়ে মদীনার পাহাড়সমূহের সমান হবে, কিন্তু ন্যায়-বিচারের দাঁড়ি-পাল্লায় এগুলোর কোন ওজনই থাকবে না।

جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ — فِرْدَوْس-এর অর্থ সবুজে ঘেরা উদ্যান। এটি আরবী শব্দ, না অনারব এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। যারা অনারব বলেন, তারাও ফারসী রোমী, না সুরইয়ানী ইত্যাদি সম্পর্কে নানা মত পোষণ করেন।

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তোমরা যখন আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা কর, তখন জান্নাতুল-ফিরদাউসের প্রার্থনা কর। কেননা, এটা জান্নাতের সর্বোৎকৃষ্ট স্তর। এর উপরেই আল্লাহ্র আরশ এবং এখান থেকেই জান্নাতের সব নহর প্রবাহিত হয়েছে।—(কুরতুবী)

لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا —উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতের এ স্থানটি তাদের জন্য অক্ষয় ও চিরস্থায়ী নিয়ামত। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এ আদেশ জারি করে দেবেন, যে জান্নাতে প্রবেশ করেছে, তাকে সেখান থেকে কখনও বের করা হবে না। কিন্তু এখানে একটি আশংকা ছিল এই যে, এক জায়গায় থাকতে থাকতে অতিষ্ঠ হয়ে যাওয়া মানুষের একটি স্বভাব। সে স্থান পরিবর্তনের ইচ্ছা করে। যদি জান্নাতের বাইরে কোথাও যাওয়ার অনুমতি না থাকে, তবে জান্নাতও একটি কয়েদখানার মত মনে হতে থাকবে। আলোচ্য আয়াতে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, জান্নাতকে অন্যান্য গৃহের আলোকে দেখা মূর্খতা বৈ নয়। যে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে, জান্নাতের নিয়ামত ও চিত্তাকর্ষক পরিবেশের সামনে দুনিয়াতে দেখা ও ব্যবহার করা বস্তুসমূহ তার কাছে নগণ্য ও তুচ্ছ মনে হবে। জান্নাত থেকে বাইরে যাওয়ার কল্পনাও কোন সময় কারও মনে জাগবে না।

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ
كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا (١٠٩) قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى
اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا
صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا (١١٠) ع

(১০৯) বলুন ঃ আমার পালনকর্তার কথা, লেখার জন্যে যদি সমুদ্রের পানি কালি হয়, তবে আমার পালনকর্তার কথা শেষ হওয়ার আগেই সে সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে যাবে। সাহায্যার্থে অনুরূপ আরেকটি সমুদ্র এনে দিলেও। (১১০) বলুন ঃ আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ্‌ই এক-মাত্র ইলাহ্‌। অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি লোকদেরকে বলে দিন ঃ যদি আমার পালনকর্তার বাণী (অর্থাৎ যেসব বাক্য আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী ও উৎকর্ষ বোঝায় এবং এসব বাক্য দ্বারা কেউ আল্লাহ্‌র গুণাবলী ও উৎকর্ষ বর্ণনা করে, তবে এসব বাণী) লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র (অর্থাৎ সমুদ্রের পানি) কালি হয় (এবং তদ্দ্বারা লেখা শুরু করে) তবে আমার পালনকর্তার বাণী শেষ হওয়ার আগেই সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে যাবে (এবং সব কথা আয়ত্তে আসবে না); যদিও সমুদ্রের অনুরূপ আরেকটি সমুদ্র (এর) সাহায্যার্থে আমি এনে দেই (তবুও সে বাণী শেষ হবে না, অথচ দ্বিতীয় সমুদ্রও শেষ হয়ে যাবে। এতে বোঝা গেল যে, আল্লাহ্‌র বাণী অসীম। তাঁর পরিবর্তে কাফিররা যাদেরকে আল্লাহ্‌র শরীকরূপে গ্রহণ করেছে, তাদের মধ্যে কেউ এমন নয়। তাই বিশেষ করে তিনিই একমাত্র উপাস্য ও পালনকর্তা। কাজেই তাদেরকে) আপনি (একথাও) বলে দিন ঃ আমি তো তোমাদের সবার মতই একজন মানুষ (খোদায়ীর দাবীদার নই এবং ফেরেশতা হওয়ার দাবী করি না। তবে হ্যাঁ) আমার কাছে (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) ওহী আসে (এবং) তোমাদের সত্য মা'বুদই একমাত্র মাবুদ। অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে (এবং তার প্রিয়পাত্র হতে চায়), সে যেন আমাকে রসূল স্বীকার করে, আমার শরীয়ত অনুযায়ী সৎ কর্ম সম্পাদন করতে থাকে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হাদীসে বর্ণিত শানে-নুযূল থেকে সূরা কাহ্‌ফের শেষ আয়াতে উল্লিখিত বাক্য। وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا সম্বন্ধে জানা যায় যে, এখানে উল্লিখিত শিরক দ্বারা 'গোপন শিরক' অর্থাৎ রিয়া তথা লোক দেখানো মনোবৃত্তি বোঝানো হয়েছে।

ইমাম হাকেম তাঁর মুস্তাদরাকে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক মুসলমান আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করত এবং মনে মনে কামনা করত যে, জনসমাজে শৌর্যবীর্য প্রচারিত হোক। তারই সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতটি

অবতীর্ণ হয়। (এ থেকে জানা গেল যে, জিহাদে এরূপ নিয়ত করলে জিহাদের সওয়াব পাওয়া যায় না।)

'ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে আবিদ্দুনিয়া' 'কিতাবুল ইখলাসে' তাউস থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার জনৈক সাহাবী রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে বললেন ঃ আমি মাঝে মাঝে যখন কোন সৎকর্ম সম্পাদনের অথবা ইবাদতের উদ্যোগ গ্রহণ করি, তখন আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টিই থাকে আমার উদ্দেশ্য ; কিন্তু সাথে সাথে এ কামনাও মনে জাগে যে, লোকেরা আমার কাজটি দেখুক। রসূলুল্লাহ্ (সা) একথা শুনে চুপ করে রইলেন। অবশেষে উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

আবূ নঈম 'তারীখে আসাকির' গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে লিখেছেন ঃ জুনদুব ইবনে সুহায়েব যখন নামায পড়তেন, রোযা রাখতেন অথবা দান-খয়রাত করতেন এবং এসব আমলের কারণে লোকদেরকে তার প্রশংসা করতে দেখতেন, তখন মনে মনে খুব আনন্দিত হতেন। ফলে আমল আরও বাড়িয়ে দিতেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়।

এসব রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, আয়াতে রিয়াকারীর গোপন শিরক থেকে বারণ করা হয়েছে। আমল আল্লাহ্র উদ্দেশে হলেও যদি তার সাথে কোনরূপ সুখ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির বাসনা থাকে, তবে তাও একপ্রকার গোপন শিরক। এর ফলে মানুষের আমল বরবাদ বরং ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু অন্য কতিপয় সহীহ্ হাদীস থেকে এর বিপরীতও জানা যায়। উদাহরণত তিরমিযী হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ একবার তিনি রসূলুল্লাহ্র কাছে আরয করলেন, আমি মাঝে মাঝে আমার ঘরের ভিতরে জায়নামাযে (নামাযরত) থাকি। হঠাৎ কোন ব্যক্তি এসে গেলে আমার কাছে ভাল লাগে যে, সে আমাকে নামাযরত অবস্থায় দেখেছে। এটা কি রিয়া হবে ? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আবূ হুরায়রা, আল্লাহ্ তোমার প্রতি রহম করুন। এমতাবস্থায় তুমি দু'টি সওয়াব পাবে। একটি তোমার সে গোপন আমলের জন্য যা তুমি পূর্ব থেকে করছিলে এবং দ্বিতীয়টি তোমার প্রকাশ্য আমলের জন্য যা লোকটি আসার পর হয়েছে। (এটা রিয়া নয়)।

সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে, একবার হযরত আবূযর গিফারী (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলুন, যে কোন সৎ কর্ম করার পর মানুষের মুখে তার প্রশংসা শোনে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ تلك عاجل بشرى المؤمن অর্থাৎ এটা তো মু'মিনের নগদ সুসংবাদ (যে তার আমল আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করেছেন এবং বান্দাদের মুখে তার প্রশংসা করিয়েছেন)।

তফসীর মাযহারীতে বলা হয়েছে, প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতের তাৎপর্য এই যে, নিজের আমল দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির সাথে সৃষ্টজীবের সন্তুষ্টি অথবা নিজের

সুখ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির নিয়তকে শরীক করে নেওয়া এমনকি, লোকমুখে প্রশংসা শুনে আমল আরও বাড়িয়ে দেওয়া। এটা নিঃসন্দেহে রিয়া ও গোপন শিরক।

তিরমিযী ও মুসলিমে বর্ণিত শেষোক্ত রওয়ায়েতগুলোর সম্পর্ক হল সে অবস্থার সাথে যে, আমল খাঁটিভাবে আল্লাহ্‌র জন্যই হয়ে থাকে, লোকমুখে সুখ্যাতি ও প্রশংসার প্রতি ভ্রূক্ষেপ থাকে না। অতঃপর যদি আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ করে লোকের মাঝে তার প্রসিদ্ধি সম্পন্ন করে দেন এবং মানুষের মুখ দিয়ে প্রশংসা করিয়ে দেন, তবে রিয়ার সাথে এ আমলের কোন সম্পর্ক নেই। এটা মু'মিনের জন্য (আমল কবুল হওয়ার) অগ্রিম সুসংবাদ। এভাবে বাহ্যত পরস্পর বিরোধী উভয় প্রকার রেওয়ায়েতের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়ে যায়।

রিয়ার অশুভ পরিণতি এবং তজ্জন্যে হাদীসের কঠোর সতর্কবাণী ঃ হযরত মাহমুদ ইবনে লবীদ (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমি তোমাদের সম্পর্কে যে বিষয়ে সর্বাধিক আশংকা করি, তা হচ্ছে ছোট শিরক। সাহাবায়ে কিরাম নিবেদন করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, ছোট শিরক কি? তিনি বললেন ঃ রিয়া। ---(আহমদ)

বায়হাকী শোয়াবুল-ঈমান গ্রন্থে হাদীসটি উদ্ধৃত করে তাতে অতিরিক্ত আরও বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা যখন বান্দাদের কাজকর্মের প্রতিদান দেবেন, তখন রিয়াকার লোকদেরকে বলবেন ঃ 'তোমরা তোমাদের কাজের প্রতিদান নেয়ার জন্য তাদের কাছে যাও, যাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে তোমরা কাজ করেছিলে। এরপর দেখ, তাদের কাছে তোমাদের জন্য কোন প্রতিদান আছে কি না।'

হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আমি শরীকদের সাথে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উর্ধ্বে। যে ব্যক্তি কোন সৎ কর্ম করে এবং তাতে আমার সাথে অন্যকেও শরীক করে, আমি সেই আমল শরীকের জন্য ছেড়ে দেই। অন্য এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, আমি সেই আমল থেকে মুক্ত; সে আমলকে খাঁটিভাবে আমি তার জন্যই করে দেই, যাকে সে আমার সাথে শরীক করেছিল।—(মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি সুখ্যাতি লাভের জন্য সৎ কর্ম করে আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাথে এমনি ব্যবহার করেন; যার ফলে সে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হয়ে যায়।—(আহমদ, বায়হাকী, মাযহারী)

তফসীর কুরতুবীতে আছে, হযরত হাসান বসরী (র)-কে ইখলাস ও রিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ ইখলাসের দ্বারা হচ্ছে সৎ ও ভাল কর্মের গোপনীয়তা পসন্দ করা এবং মন্দ কর্মের গোপনীয়তা পসন্দ না করা। এরপর যদি আল্লাহ্ তা'আলা তোমার আমল মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেন, তবে তুমি একথা বল ঃ হে আল্লাহ্, এটা আপনার অনুগ্রহ ও কৃপা; আমার কর্ম ও প্রচেষ্টার ফল নয়।

হাকীম, তিরমিযী হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) শিরকের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন ঃ هو فيكم اخفى من دبيب

النمل । অর্থাৎ পিঁপড়ার নিঃশব্দ গতির মতই শিরক তোমাদের মধ্যে গোপনে অনুপ্রবেশ করে। তিনি আরও বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে একটি উপায় বলে দিচ্ছি যা করলে তোমরা বড় শিরক ও ছোট শিরক (অর্থাৎ রিয়া) থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে। তোমরা দৈনিক তিনবার এই দোয়া পাঠ করো ঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ ؕ

وَاَنَا اَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُهٗ

সূরা কাহ্ফের কতিপয় ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য ঃ হযরত আবুদ্দারদা বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ রাখবে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।—(মুসলিম, আহমদ, আবু দাঊদ, নাসায়ী)

ইমাম আহমদ, মুসলিম ও নাসায়ী আবুদ্দারদার এই রেওয়ায়েতে একথাও বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফের শেষ দশ আয়াত মুখস্থ রাখবে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।

হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফের প্রথম ও শেষ আয়াতগুলো পাঠ করবে, তার জন্য আপাদমস্তক এক নূর হবে এবং যে ব্যক্তি পূর্ণ সূরা পাঠ করবে তার জন্য মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত নূর হবে।—(ইবনুস-সুন্নী, আহমদ)

হযরত আবু সায়ীদের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি জুমআর দিন পূর্ণ সূরা কাহ্ফ পাঠ করে, পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত তার জন্য নূর হয়ে যায়।—(হাকিম, মাযহারী)

জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের কাছে বলল ঃ আমি মনে মনে ঘুম থেকে জেগে নামায পড়তে ইচ্ছা করি; কিন্তু ঘুম প্রবল হয়ে যায়। তিনি বললেন ঃ তুমি যখন ঘুমাতে যাও তখন সূরা কাহ্ফের শেষ আয়াতগুলো قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পাঠ কর। এর ফলে তুমি যখন জাগার উদ্দেশ্য করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তখনই তোমাকে জাগিয়ে দেবেন।—(ছা'লবী)

মসনদে-দারেমীতে আছে, যির ইবনে হুবায়শ হযরত আবদাহকে বললেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফের এই শেষ আয়াতগুলো পাঠ করে ঘুমাবে, সে যে সময় জাগার নিয়ত করবে, সে সময়ই জেগে যাবে। আবদাহ বলেন ঃ আমি বারবার আমলটি পরীক্ষা করে দেখেছি, ঠিক তাই হয়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ ঃ ইবনে আরাবী বলেন ঃ আমাদের শায়খ তুরতুসী বলতেন ঃ তোমার মূল্যবান জীবনের সময়গুলো যেন সমসাময়িকদের সাথে প্রতিযোগিতা

ও বন্ধু-বান্ধবের মেলামেশার মধ্যেই অতিবাহিত হয়ে না যায়। দেখ, আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত দ্বারা তাঁর বর্ণনা সমাপ্ত করেছেন ঃ

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎ কর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে যেন কাউকে শরীক না করে।
—(কুরতুবী)

শেষ নিবেদন

আজ ১৩৯০ হিজরী সনের যিলকদ মাসের ৮ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার দুপুর বেলা সূরা কাহ্‌ফের এই তফসীর সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়। আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ ফযল ও রহমযে, এমন এক সময়-সন্ধিক্ষণে কোরআন করীমের প্রথমার্ধের কিছু বেশী অংশের তরজমা সম্পূর্ণ হল, যখন আমার বয়সসীমা ৭৬তম বর্ষপরিক্রমায় যাত্রা শুরু করেছে। যে সময়ে আমি শারীরিক দুর্বলতার সাথে সাথে দীর্ঘ দু'বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের রোগেও আক্রান্ত এবং মানসিক চিন্তার ভীড়ও অপরিসীম। এতদসত্ত্বেও আমি হতাশ নই, বরং অত্যন্ত আশাবাদী যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অপার ফযল ও কৃপায় কোরআনে করীমের অবশিষ্ট তফসীরও সম্পূর্ণ করার তওফীক দান করবেন।

—

ইফাবা—৯৩-৯৪ প্র/১৪৮৪ (উ)—১০,২৫০

যাদের সহযোগিতায় গ্রন্থখানি সংগৃহিত হয়েছে, তাদের আখেরাতের আখেরাতের নাজাতের জন্য দয়া করে একটু দোয়া করবেন।